With Best Compliments From :

A WELL WISHER

Space donated by

M/s. Imperial Electric Co

Calcutta-700016

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী

সম্পাদক

সাগর বিশ্বাস

সহযোগী সম্পাদক

সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

প্রভঞ্জন হালদার, অরিন্দম দত্ত

উপদেষ্টা

অমিতাভ চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী

কর্মাধ্যক্ষ

রমেন গুপ্ত

যোগাযোগ

এন ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

P3211?

সমীর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের জনকল্যান প্রকল্প

- দাতব্য চিকিৎসালয় (অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি)
- অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
- কুটির শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসন নির্মাণ

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ
দক্ষিণ কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা

নব শিশু নিকেতন

(চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত)

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

বিশরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
প্রধান শিক্ষক : বাদলচন্দ্র গুড়িয়া

একুশ শতাব্দী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়—৭

প্রবন্ধ

খণ্ড সময় থেকে অখণ্ড সময়ের দিকে / তারাপদ আচার্য ৯

গল্প

দুধের প্যাকেট ও প্যাকেটের মানুষ / স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৮
জীয়ন কাঠি / বিষ্ণু বিশ্বাস ২৬

কবিতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায় ৩১ [] নীলিম কুমার / মঞ্জুর দাশগুপ্ত ৩২ [] অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ৩২ [] মৃণাল দত্ত ৩১ [] সমর্পণ মুখোপাধ্যায় ৩৪ [] সমরেশ দেবনাথ ৩৪ [] দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩৫ [] গৌতম ভট্টাচার্য ৩৫ [] তনুজ নিয়োগী ৩৬ [] কৃষ্ণা রায় ৩৭ [] মুহাম্মদ সামাদ ৩৮ [] অভীক ভট্টাচার্য ৩৮ [] শচীন দত্ত ৩৯ [] বিশ্বব্রত মিত্র ৩৯ [] রতনতনু ঘাটি ৪০ [] অপর্ণা আচার্য ৪১ [] অরিন্দম দত্ত ৪২ [] দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩ [] মিহির ঘরামি ৪৩ [] পৃথ্বীশ চক্রবর্তী ৪৪ [] শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য ৪৫ [] সাগর বিশ্বাস ৪৫

স্মরণের আবরণে

সলিল চৌধুরী / কিশলয় সেন ৪৭
সবিতাব্রত দত্ত / শুভ জোয়ারদার ৪৯

বইপত্র

রবীন্দ্রনাথ : এক অনন্ত ব্যক্তিত্ব / অমলেন্দু ঘোষ ৫১

প্রচ্ছদ

এষা বিশ্বাস

Ashok Enterprise

Timber Merchants, importers
& general order suppliers

Rail Gate No— 6, Bisharpara
North 24 Parganas
Prop : Dilip Kumar Das

Space donated by .

Smt. Kanar Ojha
K, N, Trading

Simulpur
North 24 Parganas

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ।। বড়দিদি ৮·০০ ।। পরিণীতা ৮·০০ ।। চন্দ্রনাথ ৯·০০ ।। পল্লী-সমাজ ১৩·০০ ।। বিরাজ বৌ ১২·০০ ।। অরক্ষণীয়া ৮·০০ ।। বামুনের মেয়ে ১০·০০ ।। গৃহদাহ ১৮·০০ ।। গল্পসংকলন ১৮·০০ । নিষ্কৃতি ৮·০০ ।। স্বামী ৮·০০ ।। পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ।। নববিধান ৮·০০ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ।। দেনা-পাওনা ১৫·০০ । রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ।। কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ।। মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ।। দত্তা ১৫·০০ ।। চরিত্রহীন ২০·০০ ।। পথের দাবী ১৮·০০ ।। কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ।। প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ।। নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ।। বিজয়া ১০·০০ ।। রমা ৯·০০ ।।

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ।। পথের দাবী ২০·০০ ।। চরিত্রহীন ২২·০০ ।। দেনা পাওনা ১৮·০০ ।। শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ।।

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ।। সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ।।

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৫০-১৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

একুশ শতাব্দী

- তিনমাস অন্তর বেরোবে
  (জানুয়ারী—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর—ডিসেম্বর)
- বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা তিরিশ টাকা
- লেখকেরা অনুলিপি রেখে লেখা লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো ঠিকানা থাকা চাই।
- টাকাকড়ি ও গ্রাহক সংক্রান্ত চিঠি কর্মাধ্যক্ষের নামে এবং লেখা, মতামত ও সামগ্রিক নির্মাণ সম্পর্কিত চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে লিখতে হবে।

যোগাযোগ

নবার্ষ, কলকাতা

Space donated dy

A well wisher

● সম্পাদকীয়

বাঙলা লিটল ম্যাগাজিনের মিছিলে 'একুশ শতাব্দী' নিতান্তই নতুন মুখ ১৯৯১ সালের ১৬ই জুন এক কাব্য পাঠের আসরে 'একুশ শতক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের আবেগ ধ্বনিত হয়। আসরের মধ্যমণি ছিলেন এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তারপর বছর তিনেক দ্বিধা সংশয়ে কাটিয়ে শক্তির জীবদ্দশাতেই প্রস্তুতি হিসাবে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় 'একুশ শতক'। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে আর একটি। ইতিমধ্যে নামের সরকারী অনুমোদন চেয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে সর্বশেষ নাম 'একুশ শতাব্দী' অনুমোদিত হয়। অতএব যুক্তাক্ষর বর্জিত 'একুশ শতক' কথাটির প্রতি দুর্বলতা থাকলেও উপায়ান্তর নেই। এখন থেকে 'একুশ শতাব্দী' ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন বিশ শতকে ভূমিষ্ঠ নবজাতকের গায়ে একুশের নামাবলী কেন? এ সম্পর্কে আমাদের পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি হোক 'রাত্রি যেমন মিশে থাকে সকালের গায়ে, শতাব্দীও থেকে যায় অন্য কোন শতাব্দীর শরীরের সাথে। এভাবেই একুশের প্রস্তুতি থাকে বিশের জঠরে। যদি নিতান্তই শিশুমৃত্যু না ঘটে তবে তো একুশের প্রজন্ম হিসাবেই প্রতিনিধিত্ব করবে সে। অতএব নামাবলী যদি নিতেই হয় তবে তা একুশেরই হোক।'

• •

নতুন শতাব্দীর দিকে মুখ রেখে আরও একটি বছর পেরিয়ে এলাম আমরা। ১৯৯৫ সালে পৃথিবী জুড়ে দুটি সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হলো। একটি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের, অন্যটি রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার। ম্যালেরিয়ার মতো ফ্যাসিবাদও যে নির্মূল হয়নি এবং বিশ্বশান্তির পারাবত যে আজও পিঞ্জরাবদ্ধ এ কথা না বললেও চলে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই সর্বগ্রাসী দাবানল নির্বাপন ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার তাৎক্ষণিক উদ্যোগপর্ব এখনও কোটি কোটি মানুষকে মনের আরাম দেয়। সেদিক থেকে দুটি সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু তাদের কথা অনুক্ত থাকে কেন? সেই যারা বিনা অপরাধে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার শিকার হয়েছিল? আমরা তো মৃত্যুদিবসও পালন করি। তবে কেন সেই ১৯৪৫ সালে যাদের বাঁচার অধিকার পদদলিত করে অকালমৃত্যুর গহ্বরে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের কথা স্মরণে আসেনা? কেন সেই কিশোরী ইহুদী

বালিকা অ্যান ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পঞ্চাশবছর পালন করে চোখের জলে মানুষের ঘৃণা উৎসারিত হয়না? কি অপরাধ ছিল তার? আর পাঁচটা মানুষের মতোই মা-বাবার সাথে আত্মগোপন করেও বাঁচতে চেয়েছিল সে। অজ্ঞাতবাসের সেই দুঃসহ দিনগুলিতে তেরো চোদ্দ বছরের নিষ্পাপ কিশোরীর লেখা রোজনামচা ৬০ লক্ষ ইহুদী সহ আপামর নিহত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আজ বিশ্ববন্দিত। এ পর্যন্ত ৫৫টি ভাষায় আড়াই কোটিরও বেশী মানুষ অপার ভালবাসায় কিনেছে অ্যানের রোজনামচা।

ইতিহাস বলছে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন অ্যান আর তার দিদি মার্গট নাজী জার্মানীর বারজেন-বেলসেন বন্দীশালায় টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ইতিহাস তারিখ জানায়নি। জানায়নি মৃত্যুর কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য। শনাক্ত হয়নি মৃতদেহও। এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষ বলি হয়ে গেছে ফ্যাসিজমের হাতে। ১৯৯৫ সাল অ্যানদেরও ঝরে যাওয়ার শোকতপ্ত পঞ্চাশবছর।

১৯৯৫ সালের ১১ই নভেম্বর নাইজেরিয়ার বিখ্যাত লেখক কেন্ সারো উইওয়ার ফাঁসী হয়েছে। সরকারের এই ফ্যাসিস্ত বর্বরতায় আর একবার স্তম্ভিত হলো বিশ্ববিবেক। নাইজেরিয়াতে যে শতাধিক উপজাতি আছে তার মধ্যে অগোনি উপজাতির বাস দেশের তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চলে। সংখ্যা ৪ লাখের কিছু বেশী। উইওয়ার এই অগোনি উপজাতির মানুষ।

সত্তরের দশক থেকেই ধনী দেশগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারে অগোনি অঞ্চলের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন উইওয়ার। অগোনিদের অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। 'অপরাধ' এটাই। স্বৈরতন্ত্র মানুষের জাগ্রত কণ্ঠস্বর সহ্য করেনা। নাইজেরিয়ার কৌজি সরকার অগোনি অধ্যুষিত অসংখ্য গ্রাম জালিয়ে, ধর্ষণ ও গণহত্যার বিভৎসা চালিয়ে, অবশেষে লেখককেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সে কথাই প্রমাণ করলো আর একবার। অদ্ভুত গভীর এক অন্ধকারে ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে সভ্যতার যাবতীয় অহঙ্কার। □

● প্রবন্ধ

খণ্ড সময় থেকে অনন্তসময়ের দিকে

তারাপদ আচার্য

[এক]

জীবনানন্দ দ'শের মাত্র কয়েকটি কবিতা নিয়ে এই আলোচনা। কেননা, এই কবিতাগুলি স্বয়ং কবিরই নির্বাচন। একটি অনুবাদ সংকলনে ১৯৪৪-এ তিনি যে-সব কবিতা দিতে চাইছিলেন, তাদের নাম 'হাওয়ার রাত', 'বনলতা সেন' এবং বিড়াল'। এছাড়া আরো কয়েকটি নির্বাচন করে পাঠিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৪-এর ২০ মার্চ বরিশালের 'সর্বানন্দভবন' থেকে একটি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, 'আমি এই সঙ্গে Sankhamala ('শঙ্খমালা', ব. সে.), To The song-kite ('হায় চিল', ব. সে) If I were ('আমি যদি হতাম' ব. সে) Meditations ('মনোবীজ', কয়েক বছর আগে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল), Chorus ('বিভিন্ন কোরাস', 'কবিতা' ১৩৪৯) ও Antiphony ('আলোকস্তম্ভ', অনেক বছর আগের পত্রিকায় ছাপানো) পাঠালাম।'

নিজের এই কবিতাগুলি যখন প্রতিনিধিস্থানীয় ভাবছেন কবি, বিশেষত, ইংরেজিভাষার পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে চাইছেন, তখন তার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে বলেই মনে হয়।

পরিসরের স্বল্পতার কথা ভেবে এখানে শুধু চারটি কবিতার আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

মোটামুটিভাবে আলোচ্য কবিতাগুলির প্রকাশকাল সাজিয়ে দেওয়া হলো। জীবনানন্দের কবিতার রচনাকাল জানা যায় না। ধরে নিতে হবে যে, প্রকাশ-কালের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে সেগুলি রচিত হয়েছে :

'বনলতা সেন' ☐ 'কবিতা' পত্রিকা ☐ পৌষ ১৩৪২
'হাওয়ার রাত' ☐ 'কবিতা' পত্রিকা ☐ চৈত্র ১৩৪২
'হায় চিল' ☐ 'কবিতা' পত্রিকা ☐ চৈত্র ১৩৪২
'আমি যদি হতাম' ☐ 'কবিতা' পত্রিকা ☐ চৈত্র ১৩৪২

কবিতাগুলি সবই 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থভুক্ত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে যখন 'মহাপৃথিবী' প্রকাশিত হয়নি, তখন কবি ওই চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর নিজস্ব নির্বাচন-সম্পর্কিত অভিমত।

জীবনানন্দ দাশ বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ব-প্রেক্ষিতে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অসাধারণ কালজ্ঞানে ও ইতিহাসচেতনায়। তিনি জীবনের ও জগতের যে রূপচ্ছবি এঁকেছেন, তার পুরো প্রেক্ষাপটই রূপসী বাংলার নিসর্গজগৎ। আশ্চর্য এক সহজাত প্রবণতায় তিনি যেন হাতে তুলে নিয়েছেন অনন্তের চলমান স্রোতধারা, তাকে বহন করে ফিরেছেন আপন জীবনপরিধিকাল জুড়ে, তাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সমস্ত লেখাপত্রের মধ্যে : 'মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে / জন্ম নিয়েছিল কবে ; / পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন / কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিলো—/ সেইসব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে / পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে—আলো জল আকাশের টানে ; / কেন যেন কাকে ভালোবেসে।'

[দুই]

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই মোটামুটিভাবে পরিণত যৌবনশক্তির ফসল। তখন কবির বয়স পঁয়ত্রিশ কিংবা ছত্রিশ। কিন্তু যখন তিনি চল্লিশ ছাড়িয়েছেন বা পঞ্চাশ ছাড়িয়েছেন, তখনো তাঁর রচনাশক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষীয়মান হয়নি। তাঁর কবিতা সর্বতোভাবে যৌবনশক্তির পরিণত রূপকেই ধারণ করে আছে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অবিরল কবিত্বশক্তির অনির্দেশ্য চোরা টান, আর সময়চেতনা। উল্লেখ্য যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক এক সমসাময়িক সর্বগ্রাসী কবির সম্মুখবর্তী বাধা কাটিয়ে উঠেছেন। 'ঝরাপালক' তাই অনেকখানি অন্য-রকম কাব্যগ্রন্থ। সূচনাকালীন অনিশ্চয়তার দোলা এবং রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁর কবিতায় যে চিহ্ন রেখে গেছে, সে তো ঐতিহ্যের শিকড়।

অবশ্য অনেকে বলেন তাঁর লেখায় বিদেশী কবিতার প্রভাব আছে। অথচ তেমন কোনো লক্ষণ আছে বলে তো মনে হয় না। তাঁকে আবহমান বাংলা ও বাঙালির কবি বলে জানি। জানি, সভ্যতার ও কালপ্রবাহের এক বহুবর্ণময় ও রূপময় কবি তিনি। তাঁর নিজস্ব পাঠপরিধির ব্যাপকতায় যে প্রজ্ঞালোক জেগেছিল, সেখান থেকে উঠে এসেছে বিশ্ব-ইতিহাসের অনেক মণিমুক্তো। সব মিলিয়ে তাঁর যে নিজস্ব জগৎ, সেখানে আছে একধরনের 'ব্যাপ্ত অন্ধকার', সৃজনধর্মী

অবসাদ এবং সময়কে ভাস্কর্যমণ্ডিত করে তোলার সহজাত ক্ষমতা। জীবনানন্দের বিপুল-পরিমাণ গল্প-উপন্যাসেও (এখনো পর্যন্ত যার দশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়) এই একই বৈশিষ্ট্য, একই অভিঘাত।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে তাঁর নিজস্বতার অনন্ত মহিমা অনুভবে আসে। এসময় থেকেই তাঁর যুগান্তকারী জয়যাত্রা শুরু,—যা এখনো চলছে এবং বহুকাল ধরে চলবে। তাঁর কায়িক মৃত্যু এই যাত্রার কোনো ছেদ টানতে পারে না :

'তোমায় ভালো বেসেছি আমি, তাই
শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে
চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।'

সমগ্র জীবনানন্দ সম্পর্কিত ভাবনা-বুননের রূপরেখা মনে নিয়ে পৌঁছে যেতে চাই-তাঁর শিল্পশোভাময় কবিতাগুলিতে। এই চেষ্টার প্রথম সোপান হিসেবে আলোচনা করতে চাই মোট চারটি কবিতা। উল্লিখিত চারটি কবিতাই বাংলা ১৩৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রকাশ পূর্বোক্ত বাংলা সনের পৌষ মাস এবং বাকি তিনটির প্রকাশ চৈত্র মাস। ফলে, বোঝা যায় যে, 'বনলতা সেন' আগে লেখা হয়েছিল। অপর তিনটি পরে লেখা। আবার এ অনুমান সত্য না-ও হতে পারে। কেননা, জীবনানন্দ কবিতার খসড়ায় তারিখ লিখতেন না। আর খুবই পরিমার্জনা করতেন। প্রতিটি কবিতা অনেক রকমের পরিবর্তন চিহ্ন কাটিয়ে তবে মুদ্রণযন্ত্রে পৌঁছুতো। যাইহোক, পরিবেশিত তথ্য থেকে এটুকু নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারা যায় যে, কবিতাগুলি সমসময়ের রচনা।

সবার মুখে মুখে ফেরা এবং বহুল আলোচিত কবিতা'বনলতা সেন'। কবিতাটি যেন 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'-ধর্মী বাস্তব আবেষ্টনীর মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া এক আশ্চর্য তরণী। না, এ তরণী রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' নয়, অথবা, র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী'ও নয়। জীবনানন্দের এই তরণী অতীত সময়ের অন্ধকার পটভূমি থেকে উঠে আসা 'নাটোরের বনলতা সেন।'

ইতিহাস, জীবনানন্দের আরো অনেক কবিতার মতো, এখানেও যেন কথা

বলে উঠেছে। এখানে এসেছে 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ' ও 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে'—ধরনের এইসব ইতিহাসের পটভূমি। কবি যেন মানস-ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে বলছেন, 'আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।' এই প্রতীকধর্মী নারী 'বনলতা সেন' সম্পর্কে কবি আরো জানিয়েছেন, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা / মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' বিদিশার অন্ধকারকে এভাবে নারীর চুলের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া এবং শ্রাবস্তীর কারুকার্যময় মুখের কোনো অতি পুরোনো আদল বনলতা সেনের মুখে খুঁজে পাওয়ার কবিত্বময় সজীবতা একেবারেই নতুন প্রতিমা বলে মনে হয়।

এর পর আসে সময়-চেতনতার কথা। তিনি লিখেছেন 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি, পৃথিবীর পথে, / সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে / অনেক ঘুরেছি আমি।' কবি আরো বলেছেন, 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে / সেখানে ছিলাম আমি।' আবার বলেছেন, 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে',—এসব পড়লে মনে হতে থাকে, এ যেন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতিলোক তোলপাড় করে দেবার কবিতা! জন্মান্তর মানি আর না মানি, একথা তো মানতে হয় যে, বহুবছরের পুরোনো কোনো ঐতিহাসিক ধ্বংস-স্তূপের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে সবারই মন আপনা থেকে উদাস হয়ে যায়। কল্পনায় ভর করে সে তখন পৌঁছে যায় প্রাচীন কাল-পরিধিতে, যখন সেখানে মনোরম অট্টালিকা মানবসৌন্দর্যেই আলোকিত বিভায় সমুজ্জ্বল ছিল। তখন, জানা অথবা অজানা ইতিহাস যেন কথা বলে ওঠে। মনে হয়, তখন আমিও ছিলাম। আমি সেই পরিব্যাপ্ত দিশাহীন মধ্যযুগের অন্ধকারে দেখা পেয়েছিলাম এক অনন্য নারীকে, যার 'পাখির নীড়ের মতো চোখ।' দিশাহীন পথভ্রান্ত প্রাণ যেখানে আশ্রয় পেয়ে যায় অনায়াসে। যে নারীর চোখ এক আশ্চর্য ভাবাময় আশ্রয়দাত্রীর মুদ্রা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, জীবনানন্দ আরেকটি চিঠিতে (বরিশাল, ১৪.৯.৪৪) লিখেছিলেন, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছে। একজন বিদেশী Kirkman-এর 'বনলতা সেন' কবিতাটির আক্ষরিক অনুবাদ তাঁর ভালো লাগেনি। 'এই অনুবাদের এক জায়গায় raising her birds-nest eyes' আছে, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'র এত বেশি Literal translation না করে কিছুটা ভাবানুবাদ করতে পারা যায়

না কি ? বাংলায় আমি নীড় নয়—নীড়ত্বের সঙ্গে চোখের তুলনা করেছিলাম কবির ভাষা খুবই স্পর্শকাতর। একটু ভুল-ছোঁয়া লাগলেই বেসুর বাজে।

কবিতাটিতে সময়ের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। এখানে 'হাজার বছর'কে মনে হয় যেন বহু হাজার বছর। 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন / সন্ধ্যা আসে ;'—উচ্চারিত হলেই আয়ুকাল ফুরিয়ে আসার একটা আভাস ঘনিয়ে আসে। নৈঃশব্দ্যেরও শব্দ আছে যেন, এবং কবি—একমাত্র কবিই তা শুনতে পান। আর, তখনই তো 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।' তাহলে চিলের ডানায় সারাদিনের রৌদ্রের গন্ধ ছিল ? রৌদ্রেরও আবার গন্ধ ? চিলের ডানায় তা কেমন করে আসে এবং কেমন করেই বা সে-গন্ধ সে মুছে ফেলে ? এসব ভাবতে ভাবতে পাঠক-মন সজীবতা পায় আরো। তাহলে একেই কি বলা হবে কবি-ভাবনার অতিরেক ? সমস্ত ডানায় রৌদ্রতাপ তো যৌবনেরই তাপ। যৌবন তাকে বিচিত্র গন্ধে এবং উষ্ণতায় ভরিয়ে রাখে তারপর যৌবনদিন ফুরিয়ে গেলে তার সবকিছুই মুছে যায়। 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে' যায়। পাখি ও নদী তাদের গতি থামিয়ে দেয়। জীবনের লেনদেনও ফুরিয়ে আসে। কেননা, তখন তো নিঃশব্দে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কাল। সবকিছু যখন ফুরিয়ে যায়, জীবন যখন স্তিমিতবেগ, তখন সেই নিঃস্ব-রিক্ত বিবর্ণ মুহূর্ত তো 'ব্যাপ্ত অন্ধকারে' ঢেকে যায়। তখন কি আর কিছু থাকে ? কবি বলছেন, থাকে : 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'।

[তিন]

'হাওয়ার রাত'-এও 'বনলতা সেন'-এর মতো সময় ও ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এখানে এসবের ব্যবহার কিছুটা ভিন্ন রকম। তাছাড়া এখানে আছে প্রকৃতি বা নিসর্গের মাত্রা-বদলের চিত্রায়ণরেখাপুঞ্জ। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, অন্যসব উপাদানকে জীবনানন্দ মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছেন প্রকৃতির জীবন-প্রবাহে। এখানে ঐতিহাসিক উল্লেখ হিসেবে এসেছে বেবিলন, এশিরিয়া, মিশর ও বিদিশার মতো সব নাম। তবে 'বনলতা সেন'-এর মতো নয়, এ কবিতা যেন এসবের অন্তর অর্থ টেনে আনে। এর ভিতরে জাগিয়ে তোলে এক আশ্চর্য স্বপ্নময় 'ভাবনা-প্রতিভা'র জগৎ। 'হাওয়ার রাত' যেন মহাবিশ্বলোকে মানস-ভ্রমণ। যেন বিপুল যৌবনদীপ্ত এক গতিপ্রবাহ ছুটে আসে চারদিক থেকে। এ কবিতায় আছে, 'মাথার উপরে মশারি নেই আমার / স্বাতিতারার কোল

ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে ! / কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।'—এরকম রাত্রেই দেখা মেলে সমস্ত মৃত নক্ষত্রদের, দেখা মেলে 'পৃথিবীর সমস্ত ধূসর স্থির মৃতদের।' জীবনানন্দের 'কল্পনা প্রতিভা' পাঠককে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার কোনো পরিমাপ নেই : 'জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার / শালের মতো ঝলমল করছিল বিশাল আকাশ !' আরো আছে ; 'আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর / পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল'। অথবা, 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট / সজীব লোমশ উচ্ছ্বাসে, / জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়'।—এই যে এতো অন্তহীন আবেগ, একে তাহলে কি নিন্দে করবেন, অথবা খারিজ করে দেবেন আধুনিক কিংবা উত্তরাধুনিক কোনো কবি-সমালোচক ? উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করাই তো একজন আধুনিকের ধর্ম। কিন্তু না, এসব কোনো তথাকথিত তত্ত্বের কচ্‌কচানি একেবারেই কাজে আসে না। এসব যেন হাওয়ায় ভেসে যায়। এই সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততা, এই অসাধারণ অটোম্যাটিক রাইটিং যেন জীর্ণ পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান ! কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতে ছড়িয়ে আছে এমন অনুভবের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিমা যে, মনে হয়, কবির কলম একেবারে 'সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো' ছুটে চলা প্রাণশক্তির অফুরন্ত আধার। সহজাত স্বভাবের ভিতর থেকে অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসা এই কবিতা সবকিছুকেই ভাসিয়ে নেয়, মুছে দেয় সব বদ্ধতা, সব আড়ষ্টতা এবং সব মর্বিডিটি।

এই কবিতায় যেমন স্পেস বা স্থান, তেমনি কাল বা সময় কিছুটা আলাদা ভাবে ব্যবহারে এসেছে। অতীতের সব হারিয়ে যাওয়া সময়স্রোতে বর্তমানের স্পন্দন ভরে দিয়েছেন কবি। কী অমোঘ সৃজনপ্রতিভা তাঁর আয়ত্তাধীন, ভাবলে অবাক লাগে ! সন্দেহ নেই যে, একেই বলে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা। প্রতিভার শক্তি কি তাহলে সময়ের কেশর ধরে ছুটে চলার স্পর্ধা লালন করে ? মহাবিশ্বলোকের 'সমস্ত মৃত নক্ষত্ররা কাল জেগে উঠেছিল।' তারা সবাই কবির চোখের সামনেই যেন উন্মোচিত হয়েছিল। 'যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে / তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ; / যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি / কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে / কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন— / মৃত্যুকে দলিত

করবার জন্য ?'—কীভাবে আলোচনা হবে এই কবিতার ? গদ্যের এই নিরস্ত্র দ্যুতিহীনতায় কি ধরতে পারা সম্ভব জীবনানন্দের এই পংক্তিগুলির ভিতরকার সময় ও নিঃসময়ের টানা-পোড়েন ? কবি যেন সমগ্র জীবন জুড়ে এক অভিনব খেলায় মেতেছেন। তিনি সময় নিয়ে খেলা করেছেন। তিনি মানবজীবনের খণ্ডসময়কে অনন্তসময়ের মোহনায় উপনীত করে দিয়েছেন।

[চার]

'হায় চিল' ও 'আমি যদি হতাম' নামের কবিতা দুটি খুব সহজেই পাঠককে প্রাণিত করে, উন্মোচিত করে। সমস্ত ঝিমিয়ে পড়া শিরা-ধমনীতে নতুন রক্তস্রোত এনে দেয়। কেননা, প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা ও হৃদয়-ব্যাকুলতা এখানে যেন এক সর্বগ্রাসী ভূমিকা পেয়ে যায়। 'হায় চিল' শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ কান্নার শব্দে সমস্ত মন-প্রাণ উন্মথিত করে তোলে। এই কবিতায় আছে, 'তোমার [চিলের] কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।' কিন্তু কে সে ? কবির সৃষ্টি রহস্যের অন্তর্লোক থেকে যার 'বেতের ফলের কতো ম্লান চোখ' ভেসে উঠছে, কে সে ? সে এক বিরল মানবী : 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো' অপার রূপের ঝর্ণাধারা তার রূপ। আর, সে রূপ নিয়ে সে চলে গেছে।...হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত সেই বেদনাকে জাগিয়ে তুলছে চিল। চিলের কান্নার ছোঁয়া লেগে হৃদয়ের তল-অবতল বন ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। বেরিয়ে আসে বেদনা-বিক্ষত অতীত দিনের সন্তাপ। অপরদিকে, 'আমি যদি হতাম' কবিতা অনবচ্ছিন্ন প্রেম ও প্রকৃতির সমাহার। প্রেমকে যে অপার সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করেছেন কবি তা অনুসরণ করলে এই বাস্তব পৃথিবীর জীবনপরিধি বিমথিত হয়। এই কেজো পৃথিবী, হিসেবের পৃথিবী বা অসম্ভব রকমের স্থূল পৃথিবীকে কেমন করে মেলানো যাবে এই কবিতার সঙ্গে ? আমাদের এই হাজারো বিকারের লীলাভূমিতে কোথাও কি সুন্দরের জন্য কোনো প্রস্তুতি আছে ? 'আমি যদি হতাম বনহংস, / বনহংসী হতে যদি তুমি, / কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে / ধানক্ষেতের কাছে / ছিপছিপে শরের ভিতর / এক নিরালা নীড়ে ;' বাস্তব জগতের স্বপ্ন-কল্পনার পরিসরকে কবি কতোদূর নিয়ে যেতে পারেন, তার দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। নিসর্গ আর প্রেম-বিহ্বল প্রেমিক-প্রেমিকাকে কবি এতোটাই প্রসারিত করে দেন যে, তাতে তখন ফুটে ওঠে মহাশিল্পীর তুলির টানের মতো এইসব লাইন : 'আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে / আকাশের রুপালি শস্যের

ভিতরে গা ভাসিয়ে দিতাম—/ নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালী ফুলের মতো অজস্র তারা, / শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে / সোনার ডিমের মতো / ফাল্গুনের চাঁদ।'.....কিন্তু জগতের কোনো সুখস্পর্শই তো আর দীর্ঘস্থায়ী নয়। নিতান্তই ক্ষণজীবী। বুদ্‌বুদের মতো মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। 'হয়তো গুলির শব্দ'। তখন হংসমিথুনের পরিণাম : 'আমাদের স্তব্ধতা / আমাদের শান্তি।' তবুও কবি বিশ্বাস করেন এই স্তব্ধতার শান্তি অনেক ভালো, অনেক সুন্দর। কেননা, তাহলে তো এদের 'জীবনে এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না, / থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার।' সমকালীন জীবনের রিক্ততা অথবা অন্তঃসারশূন্যতার ছবি যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায় এই কবিতার অন্তর্নিহিত নিখিল জীবনচ্ছবির বাস্তবতা। 'হায় চিল' কবিতায় আছে নিখিল প্রকৃতির আবহমানতা। কেননা, 'সোনালী ডানার চিল,' 'এই ভিজে মেঘের দুপুর' আর 'ধানসিড়ি নদীটির তীর'—এই আশ্চর্য সুন্দর প্রতিমাগুলি কেমন যেন অমোঘ মৃত্যুর মতো অথবা অমোঘ সৌন্দর্যলোকের মতো। এরা জানে সেই সুন্দরের দুয়ার খুলে দেওয়ার শিল্প। এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি 'আমি যদি হতাম' কবিতার 'দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধার' অথবা 'ঝাউয়ের শাখার পিছনে চাঁদ' ওঠা, অথবা, 'শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে / সোনার ডিমের মতো / ফাল্গুনের চাঁদ।' পার্থিব সৌন্দর্যলোকের এতোদূর সীমাহীন আয়তনহীন মুক্তিতে পাঠককে ভরিয়ে তোলেন জীবনানন্দ।

[পাঁচ]

জীবনানন্দের কবিতায় সমগ্র তত্ত্ববিশ্বের প্রায় সব উপাদানই খুঁজে পাওয়া যায়। একদিকে তাঁর আবেগ রোম্যান্টিসিজিমের বোধ জাগিয়ে তোলে : 'দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি / হে সিন্ধুসারস।' আবার তাঁকে সুরিয়ালিস্ট কবি বলেও চেনা যায় : 'হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো / চারিদিকে পিরামিড—ফাল্গুনের রাত।' আবার তিনি যখন লেখেন, 'তোমার মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল / তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল / রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে / ধ'রে আছে,' তখন মনে হতে থাকে তিনি জ্যামিতিক ধাঁচ্‌, তিনি গণিক পিঞ্জার চূড়োয় আদল, কোণওয়ালা-খাঁজওয়ালা কিউবিস্ট কবি। দেখা দিতে থাকে ইম্প্রেশানিস্ট বা এক্সপ্রেশোনিস্ট অভিব্যক্তি। আবার এসবও মুছে গিয়ে মনে হয়, তিনি খুব

সম্প্রান্তরকমের মডার্ণ : 'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা'— / বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিও দিলো না উত্তর।' তারপর দেখি সেসব কোথায় সরে যায়। প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর বহুমাত্রিক পোস্টমডার্ণ ভঙ্গিমা :

'মৃত রূপসীদের বসার ভিতরে অজস্র কৃমির মতো
তোমার কবিতা অনেক পণ্ডিতের জন্ম দিল
জন্ম দিল আরো অনেক পাণ্ডিত্যের—অধ্যাপকের—অধ্যাপকদের বেতনের,
সংসার-সমাজের এই সব শাশ্বত ব্যবস্থার জন্ম দিল।'

…এর পর নতুন শতাব্দীতে আরো অনেক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটবে, আর তখনও দেখা যাবে জীবনানন্দের কবিতা সেইসব তত্ত্বের ধারক হয়েও তাকে অতিক্রম করে গেছে। □

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

একুশ শতাব্দী

ঠিক সময়ে পেতে হলে

গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়

● গল্প

দুধের প্যাকেট ও প্যাকেটের মানুষ

অন্নময় চক্রবর্তী

ছেলের বে' দেব। ছেলে আমার ইনজিনীয়ার। ঐ যে সব রাস্তা তৈরির পেল্লায় পেল্লায় যন্তর আছে না, ছেলে আমার এইটুকুন হলে কি হবে, ও সব তোরের করে। ওর নাম রাকিছিলাম বিকাশ। কেমনধারা বিকশিত হয়েছে স্থাকো। দেকলে সবাই বলবে বামুন কায়েতের ছেলে। আমি দুধ বেচি, মিথ্যে বলবনা, দুধে জল দি, কিন্তু জলে দুধ দিইনি কোনোদিন। তাই ধম্মো আছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মুখ তুলি চেয়েছেন। ছেলে আমার মানুষ হয়েছে। ছেলেকে চোনা গোবর পরিষ্কার করতি হচ্ছে না, খড়ভুষি মাখতি হচ্ছে না, লোকের বাড়ি বাড়ি দুধ বিককির করতি যাতি হচ্ছে না, কারুর কতা শুনতি হচ্ছে না—স্থালা ঘোষের পো, জলটা আর একটু কম দাও। ছেলে আমার ফুল প্যান্টালুনের ভিতরে জামা ঢুকোয়ি দিয়ে বেল্ট এঁটি পকেটে হাত ঢুকোয়ি যখন খটখট হাঁটে, যেন থানার বড়বাবু, তখন কে বলবে ও হ'ল ইছাই ঘোষের ছেলে! কে বলবে ছোটবেলায় পেট ভিং ভিং নাকে সর্দি ওয়ে কিরমি! অংকে বড় সাফ ছিল মাথা। ফেল করেনি পরীক্ষায় কোন দিন। ফোরেই বুঝেছিলাম ওর ব্রেনে বুদ্ধি আছে, ধারাপাত ঝাড়া মুখস্থ, ব'ড়ে লিখতে ঠিকমত পেটকাটা মুর্ধন্য ষ লিখতো। তা ম্যাট্রিক পাশ হয়ে গেল যখন, আগে গোঁপদাড়ি ওঠেনি ভাল করে। বল্ল টেকনিকাল পড়ব আমি। আমি বল্লাম যতটাকা লাগে দোব আমি তুই ইনজিনীয়ার হ। বিকাশ আই টি আই ভর্তি হল। এই সজনেগাছি থেকে সাইকেলে দত্তপুকুর, তারপর ট্রেনে স্থালদা। আবার স্থালদা থেকে টালিগঞ্জের কলেজ। অনেক কষ্ট করেছে ছেলে। আমি বাপের ধম্মো করতে পারিনি, তবু যা পারিচি করিচি। আপেল বেদানা খাইয়েচি। নিজে বোষ্টম হয়ি মাগুর মেরে ঝোল খাইয়েচি। পাপ বল্লি পাপ, ধম্মে বল্লি ধম্মো। বিকাশ

খুব কায়দায় লেখাপড়া করিচে। এই লম্বা পেন্সার কাগজের উপর লম্বা স্কেল ফিট করি কত ড্রয়িং করল, কত লম্বা লম্বা অংক। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ছাড়াও আরও যে কতরকমের অংক আছ আমি তার কী বুঝি! দু বছর এমনিপানা তপস্যা করি ছেলে আমার ইনজিনীয়ার হ'ল, ফিটার ইনজিনীয়ার। কাউকে চাকরীর জন্য খোশামুদি করতি হয়নি, কারুর পায়ে তেল মালিশ করতি হয়নি। ছেলে আমার চাকরী পেয়ে গেল। এদিকি মুখার্জীবাবু চৌধুরী বাবুদেরও জলুনি হচ্ছে দেকে আমার মনেও যেটা হচ্ছে সেটাকে কী বলব, আহ্লাদ বলো তো আহ্লাদ; সেদিন মুখার্জীবাবু বল্লেন কিরে ইছাই, ইনজিনীয়ারের বাপ, এবার আর দুধ বেচে কী হবে? আমি বলি ছেলের পয়সায় খাব কোন দুখে? আমার হাত রয়িছে, রথ রয়িছে।

কাল সকালে আমি ষোল সের দুধ মেরিচি। ঘরে কারিগর আনালাম 'নয়হরি স্বইটস্' এর, উত্তম। দুধ মারা ছানার রসগোল্লা ভোরের করিয়ে ক্যানে চাপিয়ে আমার সব খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। ক্যানের ভিতরের রসে ভাসা রসগোল্লার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বলছে প্রেমানন্দে নাচরে ইছাই নাচরে ইছাই। সজনেগাছি গাঁ থেকে দুই কিলোমিটার দত্তপুকুর রেল ষ্টেশন। রাস্তাটার দুপাশে ছ-সাত বছর আগেও ছিল ধানজমি। এখন জমিফুঁড়ে যত নিরালা, সবুজ নিকেতন, বসন্তবাহার, সবুজ পত্তোর বেরোয়েচে। ওরাও আমার কাছে দুধ চায়। ডিম্যান আছে। এসব বাড়িতে দুধটা দিয়ে দিলে সাইকেলে কম হেঁদোতে হ'ত। কিন্তু পুরোনো খদ্দেরদের ছাড়ি কি বলে? জমিদার বাড়ি, মুখার্জী বাড়ি, সাহা বাড়ি।...পুরোনো লোক এরা সব আমার বাপের আমলের খদ্দের। মাধব-বাবুরা হলেন জমিদার বংশের। তেনাদেরই পূর্বপুরুষ কাটোয়া থেকে তিন ঘর ঘোষ আনিয়েছিলেন খাইখালাসী বন্দোবস্তে। বছরকার তিন পার্বনে দুধ দই দেবে, খাজনা লাগবে না। আমিতো সেই ঘোষেদেরই বংশ। আর মাধব-বাবুরাও হ'লেন গিয়ে জমিদার বংশ। মাধববাবু, যাদববাবু রাঘববাবুরা পাঁচ ভাই। ওধারে মেজকর্তার তিন ছেলে, ছোটকর্তার চার, আরও জ্ঞাতি গুষ্টিও আছে। এখন ঐ ইটক্যালানো জমিদার বাড়িতে আট ন'টা সংসার। এ তরফ সে-তরফ মিলে দশ সের, মানে দশ লিটার দুধ যায় রোজ। সাইকেলটা নাট-মন্দিরের সামনে ষ্ট্যাণ্ড করি, সাইকেলের কিরিং লাগাই, দু একটা গোলাপফুল চণ্ডীমণ্ডপে ভানা ঝটপটায়। ভেলি ঝটপটায়। দুশো বছর ধরে ঝটপটাচ্ছে। আবার কিরিং লাগাই, যেন ডাকছে আমার বাপ ঠাকুদ্দা পূর্বপুরুষ—কইগো মা

জননীরা, এসোগো, আমি ঘোষের পো এয়েছি··· সাইকেল কিরিং শুনে উঠোনে চলে আসে বড় তরফ, মেজতরফ, সেজো, ছোট···। শাড়ি, ম্যাকসি, শালোয়ার কামিজ। ঘটি স্টিলের ক্যান হরলিক্স এর বয়াম প্লাস্টিকের মগ···। আর আমি যেন দুশো বছরের পুরোনো ঘোষের পো আমি দুধ দিচ্ছি।

বড়কর্তার লুডি চিনি আমি, মেজকর্তার ছাতা, উঠোনের কোণের জঞ্জালে কাঁচের বোতলগুলি কিসির আমি জানি। উঠোনে, বকুলগাছের নিচে পাথরের পরীর গায়ের সবুজ শেওলায় রক্তছিটা লাগিছিল কেন, তাওতো জানি। চণ্ডী-মণ্ডপের কোণায় পড়িথাকা পাল্কিতে ঘুনপোকায় কাঠ গুড়োচ্ছে, সে আওয়াজ চিনি। ওদের কি করে বলি, আর তোমাদের দুধ দিতি পারব না, দুধ দেব নতুন বাড়িগুলোতে, ধানক্ষেত ফুড়ে যারা উঠতি নেগেছে নতুন নতুন! লিটারে দুটাকা বেশি দেবে ওরা, তবু পারিনা ছাড়তি দুশো বছরের টান। এখন আমি প্রেসারের রুগী। হাইপ্রেসার। পঞ্চানন ডাক্তার প্রেসার দেখার যন্তরে ফচফচ টিপতি টিপতি হঠাৎ থম মেরে গিয়ে বলিছিল সব্বোনাশ। ভাস্টোল সিস্টোল সব বেশি বেশি। নুন কম খাও কাকা, সাইকেল চড়া ছাড়ো।

আমি বলি আমি হ'লাম ঘোষ। সাইকেল ছাড়া চলে? পঞ্চা ডাক্তার বল্লে স্থাখো—যত কম পারো···তবে এবারে ছাড়ি দেবানে। ছাড়তিই হবে। সাইকেলে হাফ ধরি যায়। মাঝে মাঝে ভাবি আমার আশে পাশের ঐ সব নিরালা বসন্তবিহার দোলনা সবুজপত্তোর গুলিতেই দোবো, ওসব বাবুরা আমার বাড়িতে এসেই দুধ ধরবে। এইসব ভদ্রলোকেরা সামনে দুমি দুধ নিতি মনের আরাম পায়। দুধ দুইবার চৌ-চৌ শব্দে চিত্তে মহরম হয়। এখন না হয় বিশ-পঁচিশ সের বেচি, পাচসত সের নয় কম বেচব। গরু একটা ছাড়ি দেব না হয়। কি করব। বয়স বাড়ে আর শরীলির দোষ বাড়ে।

এবার গোটানোর পালা। মেয়েদের বে' দেয়া হ'ল, ছেলেটা ইনজিনীয়ার হ'ল। আর কী। এবারে খালি নাম কেত্তন। নামেই পাশ্চিত্তির হয়। পাপ বলো যদি ছেলের জন্যিই করিচি, আবার ধশ্মোও বলতি পারো। বোষ্টম হয়ি মাগুরমাছ মেরিচি। ভাবতি পারো, আশি টাকা কিলো, তবু এনিচি, পয়সার কতা ভাবিনি, ছেলেকে বলিচি, পয়সার কতা মোটে ভাবতি হবে না। রোজ টিপিনে আপেল খাবি। ছেলেটা আমার মুক রাখিচে। পাশ করতি না করতিই চাকরি। সবে কুড়ি বছরের হ'ল। এখনই কড়কড়ে নোট

শুনছে ছেলেটা আমার। ওরে বাইশ তেইশেই বে' দিয়ে দেবনে। ঘরে টুকটুকে বউ আসবে। সরতোলা ঘি খাওয়াব ওকে।

ক্যানের মধ্যে ছলাক ছলাক। আনন্দে হরি বলো মন। নাম বিলাক ছলাক ছলাক। আজ মিষ্টি বিলিয়ে কয়ি দেব আর না। আর দোরে দোরে দুধ বিলোতি পারব না। পারোতো ঘরে এসি নে যাও। হাঁ, বলব, নিঘ্যাস বলব। বলতি পারব। এ কথা বল্লি আমারে কেউ বলতি পারবেনা যত বড় মুক নয় তত বড় কতা। বলতি পারবেনা কেউ। ক্যানো বলবে? আমার ঘরে কেডা? না ইনজিনীয়ার খোকা। বড় মুখ কয়ি বলব। আর এদিকি যে জমিদার ঘরের ছেলেরা বেকার বসি আছে সব। এমন কি মাধববাবু, ইস্কুলের সেক্রেটারী, মুকে মাইক লাগোয়ি বক্তৃতে করেন, হাঁকলে দু চারশো লোক জড়ো হয়, সেই মাধববাবুর বড় ছেলেটা বি কম পাশ দিয়ি বেকার বসি আছে। মেয়েদের ইস্কুলের সামনে রোজই দেখা যাবে তারে। এরকম কত মাধববাবুর মুক চুন হয়ি যায় আমার ছেলেরে দেকলি। কিরিং-কিরিং···সরি যাও···আমি যাচ্ছি···ঘোষের পো, না, ইনজিনীয়ারের বাপ যাচ্ছি আমি, কিরিং···।

ঐ যে অনন্ত যায়। অনন্তের অ বাদ দিলি নন্ত। সঙ্গে উ যোগ দিলে নন্তু। অনন্তকে নন্তু ডাকে সব। জমিদার বাড়ির পো। মাধববাবুর। ডিউটিতে যাচ্ছে। দত্তপুকুর শান্তি পিপাসা বালিকা বিদ্যালয়ে। বলি ও অনন্তদা, ব্যস্ত আছ? ইদিক পানে একটু আসবা? বলি এট্টু হাঁ করো, ছুটো রসগোল্লা মুকি দেই, শুনেচো নেচ্ছই আমার বিকাশ চাকরিতে ঢুকিছে···এট্টু মিষ্টিমুক করাতাম···। অনন্ত একটু তাকালে শুধু। কপালে তিন থাক ভাঁজ বেরুলে। যেমনি যাচ্ছিল তেমনি চলে গেল। আর অনন্তের বাপ মাধব চৌধুরী এমন দুর্ব্যবহার করলো। কিছু বলার নেই। বলছে কী বলছ রোজ রোজ···। ইনজিনীয়ার—ইনজিনীয়ার। চামচিকেও পাখি, আরশোলাও প্রজাপতি, আর ফিটার মিস্তিরিও ইনজিনীয়ার। জাজিয়ার বুক পকেট।

ছঃ এই ঘুরোলাম সাইকেল উল্টো দিকি। পঞ্চা ডাক্তার কি ডাক্তারি পড়িচে কোনো দিন? কলকাতা গেচে; ছিল তো অবিনাশ ডাক্তারের কম্পাওার। এখন পঞ্চারে ডাক্তার বলোনা তোমরা?

মার প্যাডেল শালা সাইকেলে। জমিদারী মারাচ্ছো; আজ স্টেশনের ভিকিরিদের খাওয়াব। ঝিম ঝিম করতিচে সারা গা। ঘুরতিচে নিউ এজ টেলার, মেক আপ সেলুন, মিষ্টিমুখ। সন্তোষীমা ক্যাসেট····। বমি বমি লাগতিছে।

P32119

বমি হবে, বমি। বমির সঙ্গে কী বেরুচ্ছে? মাধব চৌধুরীর চোখ; নাক দে কি বেরুচ্ছে। রক্ত! কার রক্ত? হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রভু হে···।

(২)

ফুল নেইম বিকাশ কুমার ঘোষ। ফাদারস নেইম ইছাই ঘোষ। পার্মানেন্ট এড্রেস্ ভিলেজ সজনেগাছি পোঃ দত্তপুকুর, নর্থ চব্বিশ পরগণাস···। মান্থলি ইনকাম···কী লিখব আমি! নিল লিখব? নিল? এখন ইনকাম বলতে লাউডগা, গাছের নিমপাতা, আর পোস্ট অফিসের দুশো পঁচাশি টাকা সুদ। আর দিদিদের পাটানো মানি অর্ডার। আজ ছ'মাস বাবা বিছানায়। রসগোল্লা বিলোতে গেছিল রাস্তায় সেরেব্রাল এ্যাটাক। বাঁ অঙ্গ পড়ে গেছে। পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। বেডশোর হয়ে গেছে। পিঠে পাউডার মাখাতে হয় ভাল করে। কথা বলতে পারে না। যেদিন চারটে গরু বিক্রী হয়ে গেল, সেদিন আঁ-আঁ-আঁ করে কি সব বলতে চেয়েছিল বাবা, চোখের জল বেরিয়েছিল প্রচুর। ডান হাতে নিজের গালে চড় মেরেছিল একটা। সেদিন সারাদিন মুখে তোলেনি কিছু। এরপরেও আরও একটা বিক্রী করতে হয়েছিল। সেটা কি বাবা বুঝেছে? সকাল বেলা উঠেই কানের পাশে ডান হাতটা দিয়ে হাম্বা শোনার চেষ্টা করে। গরুদের আলাদা আলাদা গলার স্বর চেনে বাবা। হাম্বা শোনে আর গলায় আঁ-আঁ শব্দ হয়। যেন বলতে চায় বুধিকেও? বুধিকেও? বিক্রী না করে করব কী; সংসার চলবে কি করে? আর গরুর খিদমত সামলাবেই বা কে? আমাকে তো কিছু করতে দিতনা বাবা। গরুর দুধটুকুও দুইতে দিতনা বাবা। আমি জানিনা গরুর বাঁটে ঘা হলে কি ওষুধ লাগে। সবুজ দাস্তের টোটকা। জানিনা গরুর গরম হওয়া, পল খাওয়ানো, পলি ধরানো। ঘুরাই রোগ জানিনা। এনথ্রাক্স নামই শুনেছি শুধু। ইশরে, আমার মধ্যে বাবার অস্বীকার। বর্ণাশ্রম অস্বীকার। ইশরে, আমি কেন যে অঙ্কে ফিপটি আপ পেতাম···।

কেষ্ট কাকা কিনল জার্সিটা, বাজার দরের চেয়ে কমই দিল। জার্সি। দেশী দুটো কিনে নিল গরু হাটের দালাল। একটা গরু এখনো রয়েছে। মা কিছুতেই বেচতে দেবে না ওটা। ঘোষেদের বাড়ি, গরুর হাম্বা থাকবেনা, চোনা ছাড়ার ছ্যারছ্যার থাকবে না, গোবরের গন্ধ থাকবে না, তা কি হয়। আর হাম্বা না শুনলে বাবার মন খারাপ হয়ে যাবে আরও। মায়ের সামান্য গয়না আর গরুটা ছাড়া আর কিছু নেই এখন, হাগিস নেই।

চাকরিটা হঠাৎই গেল। কোম্পানী মর্ডানাইজেশন হবে। মডার্ণ মেশিন বসবে, বিদেশী। মেশিন। জার্মান কোম্পানী সেয়ার কিনেছে। অনেকেরই চাকরী গেল। পুরোনোরা ক্যাশ পেল। কোনো আন্দোলন হলনা। বেশি আন্দোলন হলে বিদেশী সেয়ার কমে যাবে। সব মেনে নিল ইউনিয়ন। আমি নতুন বলে পেলাম মাত্র তিন মাসের মাইনে। তার সবই বাবার চিকিৎসায় ভিত্‌তলে হয়ে গেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে বাবার ভাল হবার আশা নেই। একদিন মা শনিপুজো দিল। আমার হাতে সিন্নির বাটি। ঠাকুর, বাবাকে ভাল করে দাও বলতে গিয়ে বলে ফেলাম বাবাকে এবার তুলে নাও···। টেনে থাবড়া মারতে ইচ্ছে করছিল নিজেকে। এখন মুখার্জী বাবু সেদিন আমাকে বল্ল কীহে ইনজিনীয়ার, চাকরীটা কেমন চলছে ; আমি বললাম জ্যাঠা, ইনজিনীয়ার বলছেন কেন ? আমিতো ট্রেড সার্টিফিকেট পাওয়া মিস্ত্রি। মুখার্জীবাবু বল্লেন তা তোমার বাবা বলতো কিনা। আমি বল্লাম বাবার কথা ধরেন কেন—। মুখার্জী-বাবু ভালই জানেন আমার চাকরী নেই। আমিতো এরকম কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারিনা—আপনাকে একদিন দেখে নেব মুখার্জীবাবু আমিতো ফিটার। নাটবল্ট ফিট করি। পুরোনো কেতার মেশিনে পুরোনো টেকনিক। এখন নতুন নতুন সব কিছু। আমাদের এখানে নতুন আসেনি। আমি কী আর চাকরী বাকরী পাই !

সেদিন দত্ত পুকুরের স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের পাশে দেখি দুটো নতুন পোস্টার। দত্ত পুকুরের নতুন আকর্ষণ। কেবিল টিভি। মাত্র মাসিক একশত টাকার বিনিময়ে বাড়িতে কেবিল কানেকশন নিয়ে স্টার টিভি, জি. টি ভি, এম টিভি, বিবিসি ইত্যাদির মনমাতানো অনুষ্ঠান। খোঁজ করুন অনন্ত চৌধুরী জমিদার বাড়ী, দত্ত পুকুর। মানে মাধবচৌধুরীর বি, কম পাশ ছেলে ডিস এ্যান্টেনা খাটাচ্ছে। চাকর পুরোনো জমিদার বাড়ির ছাতে। ওখান থেকে তার যাবে দত্তপুকুরের বাড়ি বাড়ি। নয়ানজুলির পাশ দিয়ে, আতা গাছের ফাঁক দিয়ে কেবল টিভির তার যাবে। তার যাবে সজনেখালির পথে। নিয়ালা বসন্তবাহার সবুজ পত্রে।

স্টেশনের দেয়ালে আর একটা পোস্টার। শুভ সংবাদ ! শুভ সংবাদ ! শুভ সংবাদ ! দত্ত পুকুরে মাদার ডেয়ারির দুধ। বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করারও ব্যবস্থা আছে। ডোর টু ডোর প্যাকেট সাপ্লাই করিবার জন্য বেকার যুবক চাই। দরখাস্ত সহ সাক্ষাৎ করুন। চঞ্চল মুখার্জী। ব্রাহ্মণপাড়া। দত্ত পুকুর। তার মানে দাঁড়াচ্ছে মুখার্জীরা এজেন্সি নিয়েছে। মুখার্জী দুধ বেচবে ! আমি এখন দরখাস্ত লিখছি। দরখাস্ত সহ দেখা করতে যাব।

বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। মুখ নিচু। মুখার্জীবাবু বল্লেন চিন্তা কোরোনা। তুমি নিশ্চই প্রেফারেন্স পাবে। শত হলেও তুমি ঘোষ। দুধ তোমার হাতেই মানায়। অনেকেই চাইছে। মিস্তিরদের ছেলেটাও, যে টিকিট ব্ল্যাক করে, সেও বলছে সকালে বেলাটায় এটা করবে। আমি ওকে দেবনা। তিন জনকে দেব। হাফ লিটারের প্যাকেটে তিরিশ পয়সা কমিশন থাকবে। তেসী চল্লিশ লিটার অর্ডার ধরতে পারলে চব্বিশ টাকা। সকালে দু ঘন্টার কাজ, মাসে সাড়ে সাতশো। বিকাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, মুখ নিচু। মুখার্জীবাবুর খালি গা। ধুতি পরা, গায়ে পৈতে। কাঁঠালকাঠের চেয়ারের একটা হাতল নেই। ওখানে বসে নাভিকুণ্ডে তেল দিচ্ছিলেন। অশ্বত্থামার নামে তিনবার তিন ফোঁটা তেল মাটিতে ফেলে বল্লেন, সংকটে নিয়ম নাস্তি। হুঁ চাকরী। ব্রহ্মসন্তান দুধ বেচবে। কী আর করব। নষ্টস্য কান্তা গতি। বাউনের ঘরে গরু। তবে আমার চক্ষল তো আর বাড়ি বাড়ি দুধ দিতে যাচ্ছে না। ও হ'ল এজেন্ট। আর তুমি যদি ব্যবসা পত্তর ভাল করে দিতে পারো, তোমাকে কিছুটা পেরশোন সাব এজেন্সি দিয়ে দেবানে, নুইলে, তুলি পারবে। পারার কথা। তোমার বাবার সব খদ্দের গুলোকে তুমি ধরোনা? কী, পারবেনা ঘোষের পো? ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, মুখ নিচু।

মাধব চৌধুরী গোল থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছেন। সেগুন কাঠের চেয়ার। দেয়ালে পূর্বপুরুষের ছবি, ক্যালেণ্ডারে জ্যোতিবাবু হাওয়ায় নড়ছেন। চেয়ারটার পাশে একটা তুলো লাগানো কাঠি পড়ে আছে, কান খোঁচাবার। মাধববাবু বল্লেন, তোমাদের বংশে আমাদের বংশে কত দিনের আঠা, কিন্তু মাধার ডেয়ারির ফেয়ারির দুধে মোটে ভিটামিন নেই। পাউডার গোলা দুধ। এমনিতেই সারের শাক-সব্জী আর পোলট্রির ডিম খেয়ে পেটে গ্যাস হচ্ছে। তার উপর মাদার ডেয়ারির দুধ খেতে পারব না। এখন কেষ্টর কাছ থেকে দুধ নিচ্ছি।

বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, মুখ নিচু। মাধব চৌধুরী বল্লেন—শোন ঘোষ। যা আছে জানোইতো, ছেলে আমার কেবল টিভি না কি বলে, তার ব্যবসা করেছে। কি করবে? কোথায় চাগরী। তা শাস্তরে বলেছে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। জমিদারীও তো এক ধরনের ব্যবসাই ছিল। তা যা হোক, আমার অনন্ত তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে পারবে না, শাত হলেও জমিদারের রক্ত রয়েছে। তোমায় কিছু হ্যাণ্ডবিল দিচ্ছি, দুধের প্যাকেট দিতে যাবে যখন, একটা করে হ্যাণ্ডবিল নিয়ে যেও সঙ্গে করে। বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, মুখ নিচু।

বিকাশ সাইকেল চালাচ্ছে এখন। ওর বাবার মত সাইকেলের হাতলের দুপাশে দুধের ক্যান নেই, দুধের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ নেই। ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে প্লাস্টিকের সবুজ রং-এর ট্রে। তাতে পলিথিনের প্যাকেট। প্যাকেটে দুধ। এই দুধে বিকাশের নিজস্ব কোন নির্মাণ নেই। এই দুধের সঙ্গে নেই মিশে হাম্বা শব্দ, চোনার গন্ধ, গাভীর গভীর স্তন এবং আঙুলের কারুকাজ। খোল ভূষি কুঁচো খড় দুবেলা খাস, কিছু নেই। বিকাশ সাইকেল চালায়। কচু গাছের পাশ দিয়ে, নয়ানজুলির ধার দিয়ে তার পথে নিরালা বসন্তবাহার সবুজ পত্র। এই পথে বিকাশের সাইকেল যাচ্ছে আপাতত। প্যাকেটে দুধ। নিরালা কিম্বা বসন্ত বাহার কিম্বা কোনো সবুজ পত্রের সামনে সাইকেল থামায়। সাইকেলে কি'রিং করে না, কলিংবেল-এ করে। ভিতর থেকে বলেনা কেউ ঘোষের পো এসেচে। বিকাশ এসেছে—এরকমও বলে না। বলে—মাদার ডেয়ারি এলো। □

গণমুখী সাহিত্য সাময়িকী

আভাতি

৩৪ বছরে পদার্পন করে
লেখক পাঠক শুভার্থীদের
অভিনন্দন জানায়

● গল্প

জীয়ন কাঠি

বিষ্ণু বিশ্বাস

সুবোধদা ইশারায় আমাকে বাইরে ডেকে এনে বলল, আর কবে বুদ্ধি হবে? বৌকে দাঁড় করিয়ে দে—মোটামুটি চালিয়ে দেবে। আর তুই তো থাকলিই। এ সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে সারাজীবন আঙুল চুষতে হবে। সুবোধদার মাথায় অনেক বুদ্ধি। সত্যিই তো গ্রামখানা একবার হাতছাড়া হলে রক্ষা করা মুশকিল হবে। দয়াল মোড়ল ছিলেন আমার আপন ঠাকুর্দা। তখন থেকে সুন্দরপুরের মোড়লি করে আসছি আমরা। তিনি ছিলেন আমাদের মোড়ল বংশের প্রথম মোড়ল। সেই মোড়লি অবশ্য বৈবাহিক সূত্রে তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকে। সেই শ্বশুর আবার কার কাছ থেকে মোড়লি পেয়েছিলেন তা আমি কিন্তু বলতে পারবো না। সেসব জানবেন আমার বাবা। বাবা বলা অবশ্য আমার একদম ঠিক হচ্ছে না। তিনি আমার পরম-পূজ্যপাদ পিতৃদেব—প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ। সদা সর্বদা উচ্চমার্গে বিহার করতেন। আশপাশের দশ বারোখান গাঁয়ে মন্ত্র দিয়েছিলেন। তবু সাজানো সংসার হেলা করে গুরুগিরি ধরায় দয়াল মোড়ল রাগ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মোড়ল হবে এটিই কামনা ছিল তাঁর। আর কিছুদিন বেঁচেবর্তে থাকলে দয়ালমোড়ল অবশ্য দেখে যেতে পারতেন ছেলে তার মোড়ল ছেড়ে মোড়লের বাবা হয়েছিলেন। দশখানা গাঁয়ের লোক আমার পিতৃদেবকে মাহান্ত বলে ডাকতো। যেমন মানতো তেমনি ভক্তিও করতো। শিষ্যবাড়ী থেকে যা দান আসতো সারাবছর মচ্ছব খাইয়েও ফুরাতো না।

অনেকে ভেবেছিল আমিও বোধহয় মাহান্ত হবো। মাহান্ত হওয়া কি মুখের কথা। সেসব অনেক সাধবার ব্যাপার। দেব্যজ্ঞান অর্জন করতে হয়। পাঁচটা মানুষকে সৃষ্টির আদি অন্ত সমাজ সংসারের অনিত্য তিথি ধরে ধরে বোঝাতে হয়। পিতৃদেবের কড়ে আঙুলটা যা জানে সেটুকু জানতে পারলেই আমার মানবজনম

বন্ত। তবে হ্যাঁ, গাঁয়ের লোক আমাকে এখনো মানেগোনে। একটানা সতেরো বছর সুন্দরপুরে মেম্বারী করেছি আমি। বাপ-ঠাকুর্দার চেয়ে কম কিসে? এখন বেলট পেপারের যুগ। রীতিমতো কেমপেন করে তবে জিততে হয়েছে—হাত তোলার যুগ তো আর নেই। দয়ালমোড়লের এক দাঁত খিচোনিতেই পেনটুল হলদে হয়ে যেতো। আর এখন দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। একটা কাজ করাতে গেলে বিশবার বাবা বাছা সোনামানিক এইসব বলতে হয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সবদিক দেখে শুনে চলতে হয়। অন্তসময় তাও একরকম, ভোটের মুখে লোকে ছিঁড়ে খায়। আমার চোদ্দপুরুষের ছয়াদ লেগেছে যেন। লোকে ভাবে পয়সা আছে মেম্বারীতে। মোড়ল বাড়ীর ছেলেকে পয়সা দেখিও না। নিজের ঘ আছে তাই ধরে করে রাখতে পারি না। গরমেণ্টের পয়সায় আমি ভমুক করি। দশটা লোক মানে গোনে, সভা সমিতিতে ডাকে, থানায়, বিডিও অফিসে গেলো এটু আটু খাতির করে—এটুকুই যা।

সেই আমার আজ হাতে লণ্ঠন। অনেক ঝড় ঝাপটা সামাল দিয়ে টানা চার চারবার পঞ্চায়েত জিতে বেরিয়ে এসেছি। বীরু ঘোষ অনেক চেষ্টা করেছিল। আমার একটা লোমও খসাতে পারেনি। কিন্তু এবারে বেওকুব বানিয়ে দিল গরমেণ্টের পলিসি। কীনা, সুন্দরপুরের ছিট লেডিচ রেজার্ভ হয়ে গেল—ঐ যেমন বাসের বাঁ দিকের ছিটগুলোর লেখা থাকেনা, তেমনি। আসলে আমার কপাল খারাপ। প্রথমে ভেবেছিলাম এসব বীরু ঘোষদের চক্রান্ত। কিন্তু না—শুধু শুধু দোষ দেবো কেন? ওপর থেকে লটারী করে ঠিক হয়েছে পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। কপাল ছাড়া আর কাকে দোষ দেবো। প্রার্থী বাছাই এর মিটিং-এ আমি তো যাচ্ছিলামই না। কী হবে খামোকা বসে বসে হাই তুলে!

শেষ পর্যন্ত সুবোধদা পয়েনটা ধরিয়ে দিতেই মাথা সাফ হয়ে গেল। আমার বৌ অবশ্য তত চালাক চতুর নয়—তেমন বাইরে টাইরে বেরোয় নি বড় একটা। ভদ্দরলোকের মেয়ে আর ভদ্দরলোকের বৌ হলে যেমনটা হয় আর কি। তাই একটু কিন্তু কিন্তু ছিল। সুবোধদা বলল, ধুর। ওসব বাদ দে তো এখন। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাজ তো করবি তুই। সুবোধদা সত্যিই গুরুদেব। ইচ্ছা করলে চোখ বুজে ও মাহান্ত হতে পারতো। যাক্ দয়াল মোড়লের নাম স্মরণ নিয়ে পাকা বন্দোবস্ত করে বাড়ী ফিরে এলাম।

অনেকদিন পর মনটা আজ বেশ ফুরফুরে। বীরু ঘোষের হাড়িপানা মুখে

আবার ঝাম পড়ল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে যাবার আগে বৌকে খুলে বল্লাম ব্যাপারটা। বৌও শুনেই আঁতকে ওঠে।

—পাগল হলে নাকি? আমি হবো মেম্বার। সংসারটা চালাবে কে? তুমি? আমি বলি, দূর পাগলি! সংসার যেমন চলছে তেমনই চলবে। ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে যাও।

—সারা জীবনটা দাঁড়িয়েই তো আছি। বসতে আর তুমি দিলে কোথায়! বৌ টিপ্পনী কাটে। আজ আমার মনটাও বেশ সরেস। পিটপিট করে চোখ মটকে বল্লাম, বসতে দিইনি বলতে পারো, কিন্তু শোয়ার ব্যাপারে কোনদিন আপত্তি করিনি সেটা বলো।

বৌ ঠোঁট টিপে হাসলো, সেতো তোমার নিজের স্বার্থে গো।

বৌ এখন আমার সুন্দরপুরের মেম্বার। কিন্তু ঐ মেয়েমানুষ মেম্বার হলে যা হয়! সব কাজ তো আমাকেই করতে হয়। ঝড়ে কার ঘর পড়ল দেখতে হয় আমাকেই, কে রিলিফ পাবে এবারের কুটায় আমিই ঠিক করি। কাজের কী আর অন্ত আছে? বৌ আমার আগের মতই ঘর সংসার করে। "কই গো মেম্বারানী, কাগজটায় একটা সই দিয়ে যাও গো।' মেম্বারানী আঁচলে হলুদ-মাখা হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। 'কই গো মেম্বারসুন্দরী, এবারের মিটিং-এর রেজুলিশানটা এপ্রুব করে দাও গো।' মেম্বারসুন্দরী বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বেরিয়ে এসে বলে, কই দাও।

আজ বিচার আছে। বৌ মেম্বার হওয়ার পর প্রথমবার বিচার বসছে কিলাক ঘরে। এক সময় বটতলার মাচায় বসে হুকোয় টান দিতে দিতে বিচার করতেন দয়াল মোড়ল। গেল সতেরো বছর ধরে বিচার করেছি আমি। ফসল খাওয়ানো, আল ঠেলা, টাকা খেয়ে সুদ না দেওয়া, রাতে ঘরে ঢোকা, কত জটিল জটিল কেসের বিচার করেছি এই আমি—দয়াল মোড়লের নাতি।

সকালে হালদার পাড়ার লোকেরা এসেছিল বিচার ডাকার পারমেশান নিতে। বৌ গোপাল নিকোতে নিকোতে সব শুনেছিল: ওরা চলে যাওয়ার পর আব্দার করল, আমাকে কিন্তু আজ নিয়ে যেতে হবে। তুমি একা যাবে সে হবে না। আমি বলি, দূর, তুমি গিয়ে কী করবে?

ঝিন ঝিনে গলায় বৌ বলল, কেন আমি বিচার করতে পারবো না? আমি এবার হেসে ফেলি। বিচার খুব সোজা জিনিস ভাবছো নাকি? ওসব অনেক

পড়ালেখার কাজ। মেম্বার হলেই তো আর হ'ল না। জানতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে—তারপর। একি তোমার বড়ি দিয়ে পুঁইশাক রাঁধা! বৌ চুপসে গেল। আমি সান্ত্বনা দিই, তাছাড়া কত রকম খারাপ খারাপ কেস আসে। ভদ্দ ঘরের বৌঝিরা কখনো যায় ওখানে! আমরা বেটা ছেলে তাই গা ঘিন ঘিন করে।

কিসাব ঘরের রাস্তাটা বড় অন্ধকার। পরান হালদার লণ্ঠন দেখিয়ে আগে আগে চলল। কলরবেই জানান দিচ্ছে বেশ ভাল জমায়েত হয়েছে। অর্থাৎ কেস জমজমাট। গেলবারের একটা কেস নিয়ে তো রগড়ের একশেষ। বিধবা বৌদির চরিত্র খলন হয়েছিল দেওরের সঙ্গে। দয়াল মোড়লের আমল হলে আর কথা ছিল না। একে বিধবা তায় মাতৃতুল্য সম্পর্ক। বৌটার মাথার চুল কেটে ঘোল ঢেলে গা ছাড়া করতেন দয়াল মোড়ল। দিনকাল পালটেছে। এখন অতটা কড়া হলে চলে না। চড় থাপ্পড় মেরে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

টিনের চাল দেওয়া বারান্দায় ভিড় উপচে পড়েছে। ছেলে ছোকরার সংখ্যাই বেশী। মাস্তিগস্তি মানুষদের জন্য তিনখানা চেয়ার আর দুটো টুল পরপর সাজানো। দুটো চেয়ারের একটায় বসেছে মহীতোষ হালদার, অন্যটায় শ্রীমন্ত ঘোষ। আমাকে দেখে মহীতোষ আর শ্রীমন্ত উঠি দাঁড়াল। গম্ভীর মুখ করে ওদের বসতে বললাম। বিচার সভা আর যাই হোক ছেলে খেলা ব্যাপার নয়। এখানে সব সময় যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। আমার আসন গ্রহণের পর জনতার কলরব বেড়ে গেল। সুবল ভিড় সামাল দিচ্ছে। অ্যাই অ্যাই বসে পড় বসে পড় মেম্বার এয়েচেন—বিচার শুরু হবে একুনি। একদম কথা নয়—একদম নয়। কে কার কথা শোনে!

চেয়ারে বসে মৃদু ধমক দিতে চুপ করল সবাই। গনশার বৌ এক পাশে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুবল কনুই দিয়ে গুঁতো দিতেই সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁদতে কাঁদতে ইনিয়ে বিনিয়ে গনশার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করল তারপর। গনশা তাকে নাকি প্রায়ই মারধোর করে। গতরাতে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁচেছিল। ভর সন্ধেবেলায় পাঁক পুকুরে গা ধুতে গিয়ে বৌ ঝিদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে নাজির পুরের হাট থেকে ফিরে বৌকে না পেয়ে এমনিতেই মাথা গরম ছিল গনশার। এমন সময় যুবতী বৌকে ভেজা কাপড়ে খালি গায়ে ফিরতে দেখে ছলাক করে মাথায় রক্ত

উঠে যায়। মোষ খেদানো লাঠিটা তুলে নিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে দিয়েছিল তারপর। বুকে পিঠে অজস্র কালসিটে পড়ে গেছে। কাপড় সরিয়ে পিঠটা খুলে দেখিয়ে দিল গনশার বৌ। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে একজন পিছন থেকে টিপ্পনী কাটে, আহা বুকের দাগগুলাই বা বাকী থাকে কেনরে! আমি ধমক লাগাই, অ্যাই বাজে কথা একেবারে নয়। এটাতো বিচার শালা নাকি! উহু, মেয়েছেলের সম্মান হানিকর কোনো কথা যেন কারুর না শুনি।

মেয়ে মানুষদের আমি হেভি সম্মান করি। সুবোধদার কাছ থেকে আমি এসব শিখেছি। মেয়েমানুষ বলেই তো আর যা তা নয়। তবে হ্যাঁ, গনশার রাগ হতেই পারে। তুমি হলে বাড়ীর বৌ। তার সঙ্গের গা ধুতে গিয়ে অত গুজুর গুজুরই বা কেন বাপু! অন্য কেউ তো নয়, স্বামীই—দুটো মেয়েই যদি থাকে অত উতলা হলে চলবে কেন? দরাল মোড়ল হলে তো তোকেই এক্ষুণ ঘা জুতো খাওয়াতো।

পরান লণ্ঠন নিয়ে বাড়ী পৌছে দিল। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার মেথর বৌ। ডাকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম—মেয়ে মানুষটা ঘুমুচ্ছে। বেশ গভীর ঘুম। রান্নাবাড়ি ঢাকা দেওয়া পড়ে রয়েছে। জামাধুতি ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেও দেখি একই ভাবে অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। রাত অনেক হ'ল। নাঃ, এবার জাগাতে হবে। □

কানাকড়ি

বইমেলা সংখ্যা বেরিয়েছে

ঝড়

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বাতাসের বুকে প্রবল ঝড়ের
মাতন দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা
করে গেলেন যে মানুষটা
তার আর দেখা নেই !

যথারীতি আবহাওয়া দপ্তর
ঝড়ের খবর রটিয়ে দিল দেশময় ;
জাহাজের নোঙর স্থায়ী হলো
যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হলো
গৃহপ্রবেশের দিন বদলালো
গেরস্তের খোকা হোক
পাখিটাও ডাকলো না
ঘরের খুঁটি বাঁচাতে
ঝম ঝম বাজালো যৌবন !

সরকারী প্রচারে
বিজয় তেল ও টি. এ. খরচা হলো
হঠাৎই ঝড়টা গতি বদলে
আমাদের স্নেহ পরিত্যাগ করে
অন্য মহাদেশে পাড়ি দিলো

বহুদিন ঝড় দেখিনি
আহা ! ঝড় দেখা হল না
আমাদের ! □

একটি কবিতা

মূল : অসমের কবি নীলিম কুমার
অনুবাদ : মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

একটি সন্ধ্যা মরে পড়ে আছে গ্রন্থাগারে
নক্ষত্রদের মৃতদেহের পাহাড়ে সেই সন্ধ্যা দাঁড়িয়েছিল
গতকাল আমার কাছে তা দুফোঁটা রক্তভিক্ষা করেছিল

গতকাল আমি জানতাম না
আমার রক্ত, সেই পাহাড় আর সন্ধ্যার রহস্য
আজ সেই সন্ধ্যা মরে পড়ে আছে এই বইগুলিতে

সেই সন্ধ্যার নিচে
মুহূর্তের জন্য সেই পাহাড়
জীবন পেয়েছিল
আর আমার চেতনায় মৃত্যু। □

দায়

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

বিকেলে চুম্বন দিয়ে ফিরে গেছ,
সে সময়
বৃষ্টি যদি হয়ে থাকে শাশ্বত কোথাও
ক্ষণিকের ওষ্ঠ দুটি ভেজেনি তেমন,
অসীম আকাঙ্খা তাই প্রাণপণ, যেন গণরাজ্য চাই—

সে কারণে
এসো, যৌথ বাঁচি অবৈধে দু'জন, তাহলেই
সর্বনাশও সহনীয়, খেলাচ্ছলে হারতেও রাজি, যদি
চুম্বনের দায় সখি আজীবন নাও। □

প্রস্তুতি পর্ব

মৃণাল বসু

গন্তব্যে পৌঁছোনোর পর
কাঁধে নির্ভীক হাত রাখলে শবনম। মৃদু কণ্ঠে
বললে : এ আমরা কোথায় এলুম, মৃণাল ?
আমি বললুম : এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী
প্রস্রবণ গিরি,—এই সেই ভুবন ভোলানো
স্রোতস্বিনী ; সমতলে ধরিত্রীকে করেছে
সুজলা-সুফলা। তাখো, সন্ধ্যা-নিশীথের
এই সঙ্গম সময়ে পাখীরা এসেছে কুলায় ;
বৃক্ষশাখে। আকাশ জোড়া নক্ষত্র। ওরি
মাঝে এখনি উঠিবে চাঁদ। আমি বলি :
শবনম, এই গভীর প্রত্যুষে
মুক্তো ঝরা চাঁদ আলো দেবে তোমার
সুচারু ঠোঁটে / দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দেবো
আমি / শান্ত পৃথিবীর বুকে তোমার
শরীর শিহরিত হবে সৃষ্টি সুখের
উল্লাসে / এইখানে / এই ধরিত্রীর
কোমল শয্যায় / তোমার স্বেদসিক্ত
পবিত্র গর্ভ কেশরে অঙ্কুরিত হবে
আরেক অভিমন্যু / ভূমিষ্ঠ হবে এই
ধরণীতে / উদ্যত কৃপাণ হাতে / বিপ্লবের
স্বপ্ন চোখে ভেঙে দেবে পাপবিদ্ধ
সূচীব্যূহ / সাথী তার কিষাণ মজুর
জন্ম নেবে আরেক ভুবন / ধর্মহীন
বর্ণহীন উজ্জ্বল নক্ষত্র ঘেরা
আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো শবনম। পলকহীন
দুচোখ। স্বপ্নময়। রাত্রি শেষ হয়ে আসে।
ভেসে আসে প্রভাতী পাখীর কূজন। শবনম উঠে
বসলো। হাটু ভেঙে দু হাত তুললে আকাশের দিকে।
পূর্ব দিগন্তে নূতন শতাব্দীর উষাকাল।
শবনম বললে : জয় হোক মানুষের □

সংঘবদ্ধ মানুষ

সমর্পণ মুখোপাধ্যায়

কখনও কখনও
শব্দের গতির চেয়ে
অগোচরে ঘিরে থাকা শ্রুতি
হয় বড় জীবননির্ভর ;
কিছু থেমে থাকে না
কারণ ভাষা বলে দেয়
স্পষ্ট করে
এই সব সমাজ চেতনা।

কখনও কখনও
জাগ্রত ক্ষুধা অধিকার করে
মূঢ়তাও ঢেকে দেয়
বলি দেয় সুখ ;
নতুন শব্দ সংযোজনে
ফিরে আসে চেতনা
সংঘবদ্ধ হয়
জেগে থাকা মানুষ। □

স্যাওলার এলেজি

সমরেশ দেবনাথ

ইতর থাচ্ছে তার এলাকার জলবায়ু
তাকে ধরে রাখা দায়, যে গড়াতে চায় ;
সে একটি পুরুষ কেন্দ্রে রেখে
ঘুরছে বহু বৃত্তের পাশে—
তাকে ঘিরে জমছে স্যাওলা
এরপর ভোরা এসে যাবে মহিমা ! □

অপমান

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঘরের ভিতরে বন্ধ ধূপ তার সব গন্ধ নিয়ে উঠে যায়
যেখানে আঁধার যায়, আলো বেয়ে যায়
আর ধীরে ঘুরে চলে আমাদের চেনা কুয়াশার বল
অন্তিম বিস্তীর্ণ মাঠে তার প্রসিদ্ধ ঘূর্ণন

আমাদের বয়স বেড়েছে ক্রমাগত বয়স বেড়েছে
কতোনা আঘাতে নিচে পড়ে আছে ফুল
ঘাসে তার ছিন্ন পাঁপড়ির দল

কত আঘাতের দাগ সহজে মোছে না
ভেতরে যে অপমান তার চেয়ে
আহত ফুলের রেখা আর নেই

এইসব কুয়াশা-আঘাত-ফুল আমাদের
মাটি জল শিকড়ের যত্ন পেলে এরা
আরো অন্য কোনো ভূমি পেয়ে যাবে। □

শান্তি

গৌতম ভট্টাচার্য্য

শোনা গেল শান্তিকে দেখা গেছে
একজন এন, আর, আই ব্যাপারীর ঘরে।
ফের তাকে দেখা গেছে জেরিকেন হাতে
মাইল মাইল লম্বা কেরোসিন
লাইনের শেষ প্রান্তে, কল্যানের মতো।
অনেকে দেখেছে—জ্যোৎস্না রাতে
ভেঙে পড়া বহুতল বাড়ীর উঠোনে
তার স্থির বসে থাকা।
শান্তি নাকি আগেকার মতো

আর ঘরফুনো নেই !
উপকৃত এলাকায় চটপট চলে যাচ্ছে
রক্ষী বাহিনীর জিপে চড়ে ।
তার মর্মস্পর্শী বাণী শুনে
শান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে ভূমিহারা চাষী,
বেকার শ্রমিক, ভুল চিকিৎসায়
মারা যাওয়া রোগীদের আত্মীয়স্বজন
আর
স্নেহময়ী রাত্রির মতন অবিরল
কালো শান্তি ঝরে পড়ছে
শহরে ও দূর মফঃস্বলে । □

একটি প্রেমের কবিতা

তন্ময় নিয়োগী

তুমি খুলে দিলে আকাশ অন্তহীন
আমি কোনমতে খুলেছি দুয়ারখানা ।
তাতার আলোয় জ্বলে ওঠে চারিদিক
এমন তীব্র আলোয় রেখো না রেখো না ।।

তার চেয়ে আনো দিগন্তে কালো মেঘ
মেঘে মেঘে ঢাকো আমার প্রদীপগুলি ।
চল ফিরে যাই আমাদের শৈশবে
আবার না হয় একাদোক্কা খেলি ।।

আমাদের এই ভাঙনের আদরে
এভাবেই হোক্ আমাদের অভিসার ।
তুমি এঁকে দাও নীলসমুদ্র দ্বীপ
আমি কেটে চলি অনন্ত ডুবসাঁতার ।।

জীবনের এই আঁকিবুকি ঝুঁকি খেলা
আমরা ক্লান্ত সমস্তদেহে ক্ষত
তার চেয়ে ভালো তুমি স্থির জল হও
আমি মুখ দেখি নার্সিসাসের মতো ।। □

অকাতরে

কৃষ্ণা রায়

কার্তিকের মরসুমী রাতে
ছুরি ও কলম দুজনকেই ছুঁয়েছিল হিম
পাতা ঝরে, বাতাস হাত পাতে।
এই ভাবে চলে যায় ঋতু
ধুলো ওড়া গোধূলির শেষে
নিজের কাছে ফিরে আসা।

তোমাকে পাশে নিলে
নদীতে মাদক গন্ধ
বাইরে গলিত কলার সমারোহ
বেশতো ছিল পাখির পালক
তোমার খোঁপায়
আসমান জমিন ছাপাতে
মন বড় ভাঙচুর করে
ধানক্ষেত, টিলা, নোনা জল অবসর
মামুলি স্বপ্ন অটুট শরীরে
হেঁটে চলে আলপথ
একই দিনে প্রমোটার ও পুরোহিত
জন্মদিন সারে
অবাধ্য প্রশ্রয়ে সতেজ হয় নিজে
শুধু তোমার ছবি বিশ্বাসভার
থামিয়ে দেয় অকারণ উচ্ছ্বাস
কেন নিলে ডানায়
গৃহবাসীই বলে দিতে পারে
কতটা পরাজয়।
মনোরম ভুলে মোছনারও হাতে ঘড়ি। □

নারী ও ভাস্কর

মুহাম্মদ সামাদ

কালো চোখে সমুদ্রের অতলান্ত গভীরতা
শীর্ণ ভুরু যেন তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদ
ছোট নাক ফোটা-ঘামে-ভরা আদর পিয়াসী
কোনো কোমল কিশোরী-মুখ
পাতলা ঠোঁটে পাহাড়ী ঝর্ণার মতো খসে পড়ে
বেদনার যতো কথা
এলোচুল দুর্বল রোগীর মতো ঘাড়ে শোয়া
হলুদ দেয়ালে বসা ছোট্ট মাছির মতোন থুতনীতে
একটা বড়ো তিল
মায়াবী করুণ মুখে অবিশ্রান্ত ক্লান্তির বৈশাখী ঝড়
হাতুড়ি বাটাল ছেনী নিয়ে উন্মুল উদ্‌ভ্রান্ত
আমি এক তরুণ ভাস্কর ॥ □

দশই জুলাই

অভীক ভট্টাচার্য

একদিন বৃষ্টির মধ্যে ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ মন খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল তোমার, পায়ের
তলায় বইতে থাকা জলে কান পেতে তুমি শুনেছিলে
অন্য এক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, চটি থেকে ছিটকে ওঠা
কাদার মধ্যে তুমি দেখেছিলে আনন্দ, আকাশ থেকে
ঝরতে থাকা জলের মধ্যে তুমি খুঁজে পেয়েছিলে
ফুরনোবেলার ফেলে আসা টুপি
তুমি ভেবেছিলে, এবার সব সমস্যা কেটে যাবে তোমার—
ম্যাজিকের মতো
হাওয়ায়, তোমার মাথার ওপর উড়ে এসেছিল টাটকা
পালং পাতার মতো উজ্জ্বল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট
লেটার, একটা ক্ল্যারিওনেট, একটা সাদা মেঘ
তুমি দেখেছিলে, ঝকঝকে আকাশের মতো একটা বাচ্চা
তোমার কাছে চুয়িংগম চাইছে, খেলনা চাইছে □

মৃত্যুর ফলক

শচীন দত্ত

রুক্ষ মুখ শুষ্ক তৃণ সবুজের চিহ্ন অবলোপ
মাঠের গোধূলি নীচে স্রিয়মাণ পদচিহ্ন ফেলা
দিগন্তহীন অনুচ্চারে উদ্ভ্রান্ত শব্দের হাঁটা চলা
বিশ্বাসের দিন শেষ। শিরস্ত্রাণে বুলেট প্রকোপ।

মুখ নিয়ে মুখোসের অবিরাম প্রকল্প নির্মাণ
বিকৃত বিন্যাসে কাঁপে নেশা চোখে আঙুলে ট্রিগার
পাখিরা মুহ্যমান ভেঙে নিমেষেই হয় ছত্রাকার
রক্তাক্ত চাবুক পিঠে বিড়ম্বিত শৃংখলে সন্তান।

সংঘাতের আবরণ ছিঁড়ে আসে একুশ শতক
আর-ডি-এক্স বিস্ফোরণে প্রজ্জ্বলিত চৌচির পাহাড়
লাভা স্রোতে সমাকীর্ণ মৃত জীব, বস্তু সমাহার
শেষ রাতে লিখে রাখে শতাব্দীর মৃত্যুর ফলক। □

না বলা কথার পিছনে

বিশ্বব্রত মিত্র

অনেক কিছুই লিখতে পারি এখন,
স্বপ্ন, স্বপ্নের আকার, তার রঙ-রস-শব্দ ময়
অনেক কুসুমাকীর্ণ রাস্তার কথা ভাবতেই পারি,
ভাবনা আমার স্বাধীন, সত্তা স্বাধীন—
নীল আগ্নেয়গিরির মতো।
নীল আগ্নেয়গিরি যেমন পৃথিবীর কথা ভাবে না,
আর লাভার বমি করে না,
কঠিন কঠোর হয়ে জমে থাকা বহু বছরের

পুরানো লাভার উদ্গিরণে ইতিহাসে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে,
আমিও তেমনি স্বার্থপর হতে চলেছি,
স্বপ্নময় স্বার্থপরতা এখন আমাকে ঘিরে রাখে।
অনেক কিছুই লিখতে পারি এখন,
অনেক কষ্ট বর্জিত আত্মহননের কথা
প্রথম প্রেমের ওষ্ঠেনর পৃথিবী
যখন রঙীন বিষ্ঠার মোড়ক উপহার দেয় তখনকার কথা,
মড়ক লাগা মনের কারখানার ভাঙাচোরা
ইতিহাসও লিখতে পারি, কিন্তু কেন ?
কেউ প্রশ্নও করবে না কোনদিন ? □

পথসংহিতা

রতনতনু ঘাটী

পথ চলেছে আমার পাশে-পাশে
কেউ ছোটে আনন্দে কেউ ত্রাসে।
ছুটছ যারা আমার কথা শোনো
পথের আজ কাজ নেই তো কোনো
গানও আছে গানের সুরে-সুরে
জানাও কাকে বিনয়ে সংশয়ে
কষ্টে থাকো অভাবে অনটনে
সেসব কথা দাগ কাটে কি মনে ?
তোমরা যারা আমার পাশে-পাশে
হাঁটছ আর ফুল আঁকছ ঘাসে
তারাই শোনো, তারাই শুধু শোনো—
পথের আজ কাজ নেই তো কোনো ! □

ভয়

অপর্ণা আচার্য

কেউ, হয়তো বা অনেকেই
ভয়ে সন্নিবিড়, সাথে সাথে থাকে,
গায়ে গায়ে মিশে, পাশাপাশি হাঁটে
ভয়ের দেহে দেহ করে দান—
অতল বিভ্রান্ত উত্তাপ বর্জিত
নিরুত্তাপের দু'ডানার কোণে
নিজ অস্তিত্ব সন্ধানী।
এরা ভয়ে সম্মূঢ়, ভয়ের সন্নিকর্ষী,
শিথিল দেহ প্রাণে বরফের স্রোত
বরফের পাহাড়ে শরীরের শব।
কখনো মনে হয় কালো পর্দায়
মুখ ঢাকা সমস্ত রাত ;
কিংবা গোছা গোছা চাপ চাপ
কায়াহীন ছায়া
একা নয়, সঙ্গ সমৃদ্ধ
মনের বিস্তীর্ণ চরে হাঁটে।
চারিদিকে শুধু নিশাচর নিশাচরীর.
তীক্ষ্ণ কুটিল চাউনি,
সমৃদ্ধ সলীল সঙ্গমী।
কোথাও নেই আলোর জলপ্রপাত,
সময়ের স্রোতে ভাসমান জীবনের শ্বাস।
মজুর জীবন থেকে বিবাসন
নেওয়া মরুথের রেশ টুকু
ছোঁয়া যায় কি না যায়।
সুরালাপের মাঝে চলে
অবাধ বিলপন।
সেতারের ছেঁড়া তারে
অসংলগ্ন পা দু'টি পেতে,
অন্ধকারের হাত ধরে হাঁটা।
জীবনের পথে পথে
নিবিড় ঘন উপচানো
সমৃদ্ধ কালো কুচকুচে ভয়
কবে যে আলোয় সমৃদ্ধ হবে। □

মৃত্যুর পরে চলে এসো

অরিন্দম দত্ত

মৃত্যুর পরে চলে এসো—তোমায় কবিতা শোনাব
মৃত্যুর পরে চলে এসো—তোমায় শরীর বদলে দেব,
তোমায় মৃত্যুর রঙ পালটিয়ে দেব,
মৃত্যুর 'পর তুমিতো স্বাধীন,
মৃত্যুর পরে চলে এসো তোমায় কবিতা শোনাব
জেব্রার নীল গ্রীবা থেকে যেভাবে আগুন ছিড়ে ফেলেছ একদিন
যেভাবে বালিশের সমস্ত তুলো উড়িয়েছো আকাশে
ঠিক সেইভাবে মৃত্যুর পরে তুমি হেটে যেও দীর্ঘ পথ ধ'রে
মৃত্যুর পরে তুমি হেটে গেলে তোমার শব্দ হবে না, গন্ধ পাবে না কেউ।
ভালবাসা না পেয়ে একদিন তুমি রক্তারক্তি করেছিলে
ভালবাসা না পেয়ে, ছুটেছিলে ছায়াগোল সমুদ্রের কাছে, লবণের কাছে,
জোছনার কাছে, ধ্বংসের কাছে, তবু মানুষের কাছে গেলেনা কখনো
আমিও তো জানি ভালবাসা না পেলে মানুষের কত কষ্ট হয়

পাতাগুলো রঙ পালটিয়েছে,
ছায়াগুলো রঙ পালটিয়েছে, মৃত্যুগুলোও রঙ পালটিয়েছে
গোলার্ধ থেকে উঠে আসা চক্রের কারুকাজ, নাবিক—
নাবিক দেখতে পায় মানচিত্র, মানচিত্র গুলো রঙ পালটিয়েছে
কবি দেখছে জোছনার বিষ, সবুজ অসুখ, মেয়েদের মুখ
মুখ গুলোও রঙ পালটিয়েছে, অসহ্য সুন্দর নেই আর
কবি দেখছে, পিতামহ, প্রপিতামহের পদছাপ
দেখতে পায় অজস্র ঈশ্বরের সাথে হেটে যায় তার সন্তান
সন্তানের রঙ পালটিয়েছে.....
মৃত্যুর পরে চুম্বনহীন অসংখ্য চুম্বন করবো তোমায়
যেভাবে মৃত্যুহীন অসংখ্য মৃত্যু হয় আমার
সেইভাবে ভালবাসাহীন অসংখ্য ভালবাসা দেব তোমায়
মৃত্যুহীন অসংখ্য মৃত্যু দেব তোমায়. জন্ম দেব, সর্বনাশ দেব
কুকুরের মত ছুড়ে ছুড়ে দেব কবিতার রক্ত-মাংস
মৃত্যুর পরে চলে এসো—তোমায় কবিতা শোনাব। □

শিব-পার্বতী

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরের মধ্যে লুকিয়ে আছে রাত্রির ছায়া,
রাত্রির মধ্যে আছে ভোরের আলো।
একজন শিব, আর একজন পার্বতী!
কিন্তু কে শিব, কে পার্বতী?
চেহারা দেখে বুঝতে পারো না? পোশাক দেখে?
তাই দুপুরকে বলি, তুমি রাত্রি হয়ে যাও!
রাত্রিকে বলি, হও সকাল।
শিবকে বলি, তুমি হও পার্বতী
পার্বতীকে বলি, হও শিব!
প্রসাধনের বাক্স হাতে সেই সকাল থেকে
দাঁড়িয়ে আছি, যাতে ওরা আমার এই
হাতে-ধরা আয়নায় মুখ দেখে
প্রসাধনের শেষ খুঁতটুকু মুছে নিতে পারে।
কিন্তু ওদের সময় হয় না……
ওদের জন্য অপেক্ষা করছি এমন এক শহরে,
যেখানে ভাঙাচোরা রাস্তা ও বাড়িঘরের ফাটল
দেখে মনে হয়,
লাগাতার ভূমিকম্পের দেশে এসে পড়েছি। []

কল্পকথা

মিহির ঘরামী

খাদ্যনিগমের শস্য অন্ত পথে বিলি হয়ে গেলে
অযথা চাতকসারি দৃশ্য হয় রেশনের শপে
দৈনন্দিনতাক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত ঘরে মাথা খুঁড়ে মরে দীর্ঘশ্বাস
আকাশে কুসুম ফোটানোর কল্পকথা
বাসাবাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকে।

একমাত্র কথকতা উইকএণ্ডে, রবিবার জুড়ে
স্নায়ুশাসিত ক্ষুধা, ভাতঘুম, সান্ধ্য-শো আবার টিকিজে।

এ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত নিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘু সামান্ত বণ্টনে
পাত্র-মিত্র অংশীদার, অনুগামী অমাত্য, উজীর
খরা-মারী-অভাব সম্ভূত পরজীবী ক্ষমাহীন তর্জনীর শিথিলতা বুকে।

প্রতীকের সিংহছাপে খাবাপিষ্ট রোগা ও নিরীহ মূক প্রাণী
ওষ্ঠাগত আয়ু রাখে কৃতাঞ্জলীমুক্ত মুঠি জুড়ে। []

সুকল্পা

পৃথ্বীশ চক্রবর্তী

একটা কবিতা লিখে দিও
নক্ষত্রলোকের ধ্রুবতারা
তোমায় দেখার মতো দৃষ্টি নেই বলে
লিখতে পারিনা
তাই
রুপালী আগুন ধরা রাতে
পাশে থাকবার নাই প্রয়োজন
রাতের শিশির হয়ে
ঝরে পড়ো
চোখের তিমিরে—অথবা
ঝলমল কোরো সন্ধ্যা তারা হয়ে
কোন এক গোধূলি লগ্নে
কিংবা
শুকতারা হয়ে
ডেকেকলো সপ্তর্ষি আমায়
চোখের তারা হয়ে
আর
বিস্তীর্ণ সবুজের মাঝে

সর্ষেক্ষেতের সৌন্দর্যের চেয়েও
মনোরম ছন্দে
গড়ে তুলে নিজেকে
ছন্দের জাদুকরী তুমি,
নয়ন তারার কোলে
লিখে দিও
দু এক লাইন। □

রূপধরা

শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য

যেমন দেখেছি ঠিক তেমনি
দম্ভহীন শিশুর মত মেঘে আর বসন্তে
টানটান পত্নীদের মত রোদ্দুরে আর শরতে
কালো মেঘে ঢাকা বৃদ্ধার মত শীতে আর বর্ষায়
দেখেছি এখানে ওখানে সমতলে অন্তঃরীক্ষে
অহংকার ও সংসারে

বার বার আসছে দেখা দিচ্ছে
কিন্তু দরজা ভেদ করে
ভিতরে প্রবেশ করছে না □

স্নান

সাগর বিশ্বাস

জল চেয়েছিলে তুমি
আকাশ ভাঙা বৃষ্টি চেয়েছিলে
আগুন নেবাবে বলে
তুমি এক নদী জল চাও
এক সমুদ্র বৃষ্টি চাও তুমি।

শ্মশানের চিতাগুলি
নিবেও নেবেনা যখন

বুকের দু'পাশে খালি
গর্ত খুঁড়ে চলে মানুষের
পরিত্যক্ত শারীরনির্যাস
জ্বালা দেয় নাসারন্ধ্রে
বাতাসের বিষনীল পাখায়
দুশিবার অসুখের বীজ,
ভরে যায় মুখের বিবর,
তখনো বৃষ্টি চাও তুমি
এক নদী জল চাও
এক সমুদ্র সর্বনাশা জল।

কত কিছু পুড়ে যায়
তোমার চোখের পরে
বুকের নিথর তলদেশে
মনোহর কাটরা পোড়ে
পুড়ে যায় হকার্স কর্ণার
এক সমুদ্র জলের চূড়ায়
ভস্ম হয় এবাডিন বাজার
তোমারও কলজে পোড়ে
শিশুর দোলনা পুড়ে যায়
পুড়ে যায় কিশোরীর জামা
তোমার ভিয়াস বৃষ্টি
কোনদিন তবুও আসেনা।

তার চেয়ে
আগুন চাওনি কেন ?
বিষে যদি বিষক্ষয় হয়
কাঁটা তুলে দিতে পারে কাঁটা
তবে তো আগুনই পারে
ছাই করে ফেলে দিতে
আগুনের যাবতীয় শিখা।

এবার থেকে বরং
আগুন থেকো আগুনটাকেই
বুকের উপর রাখো। []

● স্মরণের আবরণে

সলিল চৌধুরী

(১৯২৫—১৯৯৫)

কিশলয় সেন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর '৯৫ সলিল চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। বাঙলা গানের জগতে ইন্দ্রপতন ঘটে গেল। সলিল চৌধুরীর কথা উঠলেই মনেপড়ে তাঁর 'শপথের' পঙ্‌ক্তিগুলি—

সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।
সেদিন আকাশ জলভরা মেঘ
বৃষ্টির বেদনাকে
বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল।
এই পৃথিবীর আলো বাতাসের
অধিকার পেয়ে পায়নি যে শিশু
জন্মের ছাড়পত্র
তারই দাবী নিয়ে সারা কাকদ্বীপে
কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি
কোনো অঙ্কুর মাথা তোলেনি
প্রজাপতি যত আরো একদিন
ছটিপোকা হয়েছিল—
সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।

অহল্যা মার বেদনা আজও অমলিন হয়ে আছে দীর্ঘ সময় পেরিয়েও যাঁরা এই অমানবিক অত্যাচার শোষণযন্ত্রণাক্লিষ্ট জগতটাকে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখেন একদিন তাঁদেরই যন্ত্রণার ভাষা রূপ পেয়েছিল সলিল চৌধুরীর কবিতায়, গানে। এক উথালপাথাল সময়ের ফসল সলিল চৌধুরী।

আগামী লড়াইয়ের রক্তঝরা দিনেও তাঁর গান ফিরে আসবে এ বিশ্বাস

আমার মত আরও অনেকেই রাখেন। রক্ত মাতাল করবে। তাঁর প্রত্যয়, অনেকের কণ্ঠে রণিত হয়ে ঘোষণা করবে—

পারবে না ভোলাতে মধুমাখা ছুরিতে
জনতাকে পারবে না ভোলাতে,
আর পারবে না দোলাতে মরীচিকা মায়াতে
বিভেদের ছলনায় ছলিতে!
মিছিলের গর্জন দুর্জয় শপথে গর্জে, ঐ গর্জে,
আজ হরতাল। আজ চাকা বন্ধ।

এ বিশ্বাসে স্থিরনিষ্ঠ ছিলেন কি সলিল শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত?

এ এক গভীর বিতর্ক। তার মূল্যায়ন যাঁরা করছেন—ইতিবাচক নেতিবাচক দুটো দিকেরই নির্মোহ বিচার বিশ্লেষণ ঘটবে এটাই আশা করা যায়।

সলিল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সলিল ছিলেন কবি গীতিকার সুরকার গায়ক সঙ্গীত শিক্ষক যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালক ক্যারার গানের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় লোকসঙ্গীত ধারার বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুদক্ষ বাদক নাট্যকার আবৃত্তিকার এবং আরও নানান গুণে গুণান্বিত।

কিন্তু এ প্রতিভাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যাশিত একমুখীনতায় চালিত করার যোগ্য কাণ্ডারী ছিল কি না তা নিয়েই সংশয়িত প্রশ্ন আছে। যে মুহূর্তে গণসংগ্রামে ভাঁটা এসেছে বা ভিন্নতর কৌশল গ্রহণের তাগিদ এসেছে গণসঙ্গীতের রূপেও তার প্রতিফলন অনিবার্যভাবে ঘটেছে যেটা নজর এড়ায় না। সুতরাং এ সময়ের ধুয়োই চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক জগতে সলিলের পা রাখাটাকে 'পলায়নী মনোবৃত্তি' বা 'রেনিগেড' সুলভ অবস্থান বলে ব্যাখ্যা করাটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত—প্রশ্ন থাকবে। তবে চলচ্চিত্রে সঙ্গীত আরোপ বা আধুনিক বাঙলা গানে সুর যোজনাতেও একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য এবং দক্ষতা সলিলের জনপ্রিয়তাকে গভীরতর করেছে এটা নিঃসন্দেহ। এখানেই প্রশ্ন আসে সলিলের বোধের জগতে যে দার্শনিক ভিত্তি ছিল সেটা ব্যবসায়িক জগতের সঙ্গে কতটা সমঝোতা করেছিল। তিনি সুস্থ রুচিশীল সুন্দর জীবনবোধ হারিয়েছিলেন? তিনি কি শ্রেণী দৃষ্টি অস্বীকার করেছিলেন? সে সিদ্ধান্তে আসার আগে তাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক অনুপুঙ্খ বিচার প্রয়োজন। কারণ অধুনা গণসঙ্গীতের তাত্ত্বিক আলোচনায় সামাজিক জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত, ব্যক্তিজীবনে তার প্রতিফলন, গণসঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে জগত-জীবনের অভিজ্ঞতায় 'ক্রিটিক্যাল

DUTTA ELECTRICAL ENTERPRISES
6/A, 107 Mukundapur Colony
Calcutta-700078

Manufacturer of :

ARC Welding Transformer,
Rectifier, Spot welding etc.

With Best Compliments From :

M/S. INDIAN RAYON & INDUSTRIES LIMITED
Unit : Jayashree Textiles
Risara ☐ Hoogly.

Manufacturer of :

P/V Suiting/Shirting, Linen Fabrics,
Flax yarn, RRL Hose, Flax Hose,
Blended Yarn, Woolen Yarn, Wooltops.

Ekush Shatabdi

A Distinctive Bengali periodical

Vol. 1 No. 1 January—March 1996 Rs. 10

With best Compliments of

Motul Mafatlal Lubricants Ltd.

4A Park Plaza, 4th Floor

71, Park Street

Calcutta-700016

Tel. No. 292890/293139

ডালিয়া রায় কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একুশ শতাব্দী

আত্মসমীক্ষার দর্পণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার নাট্যকলা ঃ শিকড়ের সন্ধান

ভ্রমণ ঃ উত্তরাখণ্ড

স্মরণের আবরণে ঃ নীলিমা সেন

গল্প কবিতা বইপত্র

With best compliments from

Eastern Monochem (P) Ltd

Manufacturer of
Various Chlorinated Products

Office : L-10, Nabadarsha Society
Calcutta-700051
Phone : 512-4326

Space donated by

Shambhu Nath Ghosh

Bamangachi
Howrah.

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ—১ □ সংখ্যা—৩ □ ১৯৯৬

(জুলাই—সেপ্টেম্বর)

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী □ সুমিতা দত্তচৌধুরী,
প্রভঞ্জন হালদার, অরিন্দম দত্ত

উপদেষ্টা □ অমিতাভ চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী

কর্মাধ্যক্ষ □ রমেন গুপ্ত

যোগাযোগ □ এন—২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ॥ বড়দিদি ৮·০০ ॥ পরিণীতা ৮·০০ ॥ চন্দ্রনাথ ৯·০০ ॥ পল্লী সমাজ ১৩·০০ ॥ বিরাজ বৌ ১২·০০ ॥ অরক্ষণীয়া ৮·০০ ॥ বামুনের মেয়ে ১০·০০ ॥ গৃহদাহ ১৮·০০ ॥ গল্পসংকলন ১৮·০০ ॥ নিষ্কৃতি ৮·০০ ॥ স্বামী ৮·০০ ॥ পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ॥ নববিধান ৮·০০ ॥ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৫·০০ ॥ রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ॥ কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ॥ মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ॥ দত্তা ১৫·০০ ॥ চরিত্রহীন ২০·০০ ॥ পথের দাবী ১৮·০০ ॥ কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ॥ প্রবন্ধ— নারীর মূল্য ৮·০০ ॥ নাটক— ষোড়শী ১০·০০ ॥ বিজয়া ১০·০০ ॥ রমা ৯·০০ ॥

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ॥ পথের দাবী ২০·০০ ॥ চরিত্রহীন ২২·০০ ॥ দেনা পাওনা ১৮·০০ ॥ শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ॥

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ॥ সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ॥

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ৩৫০-৯৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

একুশ শতাব্দী

(শ্রাবণ—আশ্বিন ১৪০৩)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়—৭

প্রবন্ধ

আত্মসমীক্ষার দর্পণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় / মিহির সেন—৯

বাঙলার নাট্যকলার শিকড়ের সন্ধান সলিল সরকার—১৭

গল্প

সাতপুরুষের গোরস্থান / বিষ্ণু বিশ্বাস—২২

টেলিফোন / উমা বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০

ভ্রমণ

উত্তরাখণ্ড দেখে এলাম / সাগর বিশ্বাস—৩৬

কবিতা

টোমাস ট্রান্সট্রোমার ৪৫-৪৬ ❑ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৪৬ ❑ যশোধরা রায়চৌধুরী ৪৬ ❑ অমিতেশ মাইতি ৪৭ ❑ পার্থ বসু ৪৮ ❑ কৃষ্ণা বসু ৪৯ ❑ শিখা ঘটক ৪৯-৫০ ❑ সব্যসাচী সরকার ৫১ ❑ তাপস রায় ৫১ ❑ গৌতম ভট্টাচার্য ৫২ ❑ সুমিতেশ সরকার ৫২ ❑ সমর্পণ মুখোপাধ্যায় ৫৩ ❑ নারায়ণ বিশ্বাস ৫৩-৫৪ ❑ মৃণাল দত্ত ৫৪ ❑ দিলীপকুমার মহান্তী ৫৫ ❑ সুমিতা দত্তচৌধুরী ৫৬

স্মরণের আবরণে

নীলিমা সেন / পার্থ ঘোষ—৫৭

বইপত্র

নির্বাচিত কবিতা / প্রভঞ্জন হালদার—৬০

নিজস্ব ভূমিকা / স্বর্ণকুমার পালধি—৬১

ছিটমহল / সাগর বিশ্বাস—৬৩

প্রচ্ছদ

এষা বিশ্বাস

Best wishes from

Narayan Electric Co.

37, Ezra Street, Cal-700001

Ph. 25-3937, Fax. 033-259698

With compliments from

A well wisher

R. Krishnan

নব শিশু নিকেতন

(চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত)

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

বিশরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রধান শিক্ষক : বাদলচন্দ্র গুড়িয়া

একুশ শতাব্দী

- তিনমাসে অন্তর বেরোয়
  (জানুয়ারী—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর—ডিসেম্বর)।
- গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক তিরিশ টাকা। ডাকযোগে পঞ্চাশ টাকা।
- লেখকেরা অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
  লেখার সঙ্গে পুরো ঠিকানা দেবেন। নতুন লেখকদের লেখা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়।
- টাকাকড়ি ও গ্রাহক সংক্রান্ত চিঠি কর্মাধ্যক্ষের নামে এবং লেখা, মতামত ও সামগ্রিক নির্মাণ সম্পর্কিত চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে লিখতে হবে।

ঠিকানা
এন ২১, নবাদর্শ
কলকাতা-৭০০০৫১

কলকাতায় একুশ শতাব্দী

প্রাপ্তিস্থান

- ☐ পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট
- ☐ লিটল ম্যাগাজিন স্টল, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
- ☐ ডি. পি. দত্ত
  ১০, গভর্নমেন্ট প্লেস (ইস্ট)
  এজরা ম্যানসন (সেকেণ্ড ফ্লোর)
  কলকাতা-৭০০০৬৯

বহির্বঙ্গে একুশ শতাব্দী পাওয়া যায়

মহারাষ্ট্র ☐ পি. কে. সেন
সি—১০২, শ্রীনাথ হার্মিটেজ
সোমেশ্বরওয়াড়ী, পুনে ৪১১০০৮

মধ্যপ্রদেশ ☐ শিবব্রত দেওয়ানজী
ব্লক ২৮, প্লট—৮
নেহেরু নগর (পশ্চিম)
ভিলাই ৪৯০০২০
মধ্যপ্রদেশ

Space donated by

A well wisher

সম্পাদকীয়

ভারত নামক দেশটি এখন তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দোরগোড়ায়। অচিরেই প্রচুর তোপধ্বনি, উচ্চকিত বিউগল সহ সামরিক কুচকাওয়াজ দেখা যাবে, কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে আয়োজিত উৎসবে অনেক বড় বড় কথার বন্যা বয়ে যাবে। সেই জাঁকের বন্যায় সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে এদেশের ধরিত্রীপুত্রেরাও হয়তো উত্তরপুরুষের নরম করাঙ্গুলি কড়াপড়া হাতের মুঠোয় ধরে বলবে, 'স্বাধীনতা দেখে নে বাপ, দেখার মতো জিনিষ বটো।' বলবে কারন স্বাধীনতার মানে পঞ্চাশ বছরেও তাদের বোধের অতীত রয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে যখন গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়, সকালের আলোয় ভেসে ওঠে লুণ্ঠিত ধর্ষিত নারীর মৃত মুখের মিছিল, কাজের অধিকার বঞ্চিত সমর্থ জোয়ান যখন শহরমুখী হয়, ক্লিষ্ট কিশোরীর নবলব্ধ যৌবন বিকিয়ে যায় নিষিদ্ধ এলাকার প্রশস্ত রাস্তায়, ওরা ভাবে এটাই নিয়ম— যার যেমন ভাগ্য। নরবলি, নারীবলী, ডাইনীহত্যা, ভ্রূণহত্যা, তাগা তাবিজ মাদুলী আজও তাদের কাছে ধর্মের অনুষঙ্গে গৃহীত হয়। ভূমিচ্যুত দরিদ্র কৃষক সন্তান কিংবা বন্ধ কারখানার শ্রমিক পুত্র অথবা সমাজবৃত্তে বেড়ে ওঠা বেকার যুবক আন্ডারওয়ার্ল্ডের বাসিন্দা হয়ে গেলেও ওদের চোখে তা পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির পরিণাম বলে বিবেচিত হয়। এ জন্মের সুকৃতি করা তরতাজা ছেলেও যদি খুন হয়ে যায়, যুবতী মেয়ে ঘরে ফিরে না আসে, ভাঙা পাঁজরের উপর দিয়ে খুনী এবং অপহরণকারীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বিচার এবং প্রশাসনের ধৃতরাষ্ট্র চেহারার সামনে ওরা সবকিছু ভবিতব্য বলেই মেনে নেয়।

পাশাপাশি একশ্রেণীর মানুষের সীমাহীন উচ্চাকাংখা দেশকে দুর্নীতি বিশ্বাসহীনতা ও অসততার মহাপঙ্কে নামিয়ে এনেছে। আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিজাতীয় আচার আচরণ ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেই তাঁরা ক্ষান্ত নন, সেই সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার যাবতীয় কলুষে বৃহত্তর সমাজকে আচ্ছন্ন করতে ব্যস্ত। রাষ্ট্রশক্তি তাদের সহায়। তারা দেশের অশিক্ষা

ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকরণে যতটা না আন্তরিক, বিজাতীয় শিক্ষা ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের অবাধ রাস্তা নির্মাণে ততোধিক বদ্ধপরিকর। গণমাধ্যম তথা দূরদর্শনের পর্দায় চোখ রাখলে যে কোন শিক্ষিত মানুষের মনে হতে পারে অনুষ্ঠানের সিংহভাগই দেশের মাটিতে নয়, অন্য কোন দেশ অন্য কোন সভ্যতার জঠর লালিত।

রাজনীতি যারা করেন তাঁদের অধিকাংশই নীতিটাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু 'রাজ' কেইআঁকড়ে ধরেছেন। আর সেই 'রাজ' বা ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য অধঃপতনের শেষ সোপানে নামতেও তাঁদের আপত্তি নেই। দেশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হলেও, আত্মসুখ সর্বস্ব এই রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কিছুই যায় আসেনা। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে গঙ্গাজল ছিটানোর মত শুদ্ধি করণের ভাঙা রেকর্ড বাজে। বিচার ব্যবস্থা নড়ে চড়ে ওঠে। অনেকটা আমেরিকার 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার মতো। সেদেশে নষ্টামিরও শেষ নেই আবার রাঘব বোয়ালদেরও নিস্তার থাকেনা অনেক সময়। গণতন্ত্রের মহিমা রক্ষায় সবই প্রয়োজন।

ভাল কথা যতই হোক, এদেশের মানুষ কিন্তু সবিস্ময়ে দেখে ক্রমাগত বৈদেশিক পুঁজির আগমন, দামের উর্ধগতি, গণমাধ্যমে বিদেশী সংস্থা ও সংস্কৃতির অবাধ অভিযান, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, জৈবিক তাড়নায় সমৃদ্ধ ছায়াছবির ঢঙ্গ। আবার কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের চোখে খলনায়ক রূপে তুলে ধরার নোংরা খেলাও চলে কখনও ফিদা হুসেন, কখনও বা ভবানীপ্রসাদ সাহু।

স্বাধীনতা, সুবর্ণজয়ন্তীর আলোকমালায় সজ্জিত পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় স্বাধীনতা, এই আস্ফালন ও আত্মবিস্ময় আর কতকাল চলবে! □

আত্ম-সমীক্ষার দর্পণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মিহির সেন

যে কোন লেখক প্রসঙ্গে পাঠকের একটি প্রাথমিক কৌতূহল ও পরবর্তী একটি জিজ্ঞাসা থাকে। কৌতূহল—তিনি আর কিছু না হয়ে লেখক হলেন কেন? এবং জিজ্ঞাসা—কোন প্রত্যয় বা দর্শনের আলোয় জীবনকে দেখেন তিনি, এবং আমাদের দেখানোর চেষ্টা করেন।

এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে, লেখার প্রেরণা ও প্রত্যয় প্রসঙ্গে লেখকের নিজের কোন বিশ্লেষণ বা বিবৃতি। কিছু লেখকের ক্ষেত্রে এ সুযোগ আমরা পাই। যেমন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। নিজস্ব সাহিত্য-চিন্তাই শুধু নয়, দেশ-কাল-ব্যাপী শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম রাজনীতি প্রসঙ্গেও তাঁদের ধ্যান-ধারণা অসংখ্য প্রবন্ধ আলোচনা বিতর্ক বা ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রের মাধ্যমে জানার সুযোগ পাই আমরা।

কিন্তু সমসাময়িক কালে এবং আজও বাঙলা-সাহিত্যের বিতর্কিত লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সে-প্রত্যাশা পূর্ণ করে যাননি। তার কারণ বোধ হয় দু'টি। আত্ম-কথনে তাঁর সহজাত কুণ্ঠা বা নির্লিপ্তি এবং তর্ক-বিতর্ক বা প্রবন্ধ রচনায় অনাগ্রহ বা আলস্য। তাই বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত কোন বইয়ের ভূমিকা, আলোচনা ও প্রতিবাদ বা সংঘ-সমিতির কোন প্রস্তাব বা ভাষণ ইত্যাদি থেকেই তাঁর সাহিত্য-ভাবনার সূত্র খুঁজে পেতে হয় আমাদের। অবশ্য পরিমানে কম হলেও তা থেকে তাঁর জীবন-বোধের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পেতে কোন অসুবিধে হয় না। যেমন, কেন লেখেন, এ প্রসঙ্গে তাঁর নির্মোহ জবাব—'লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।'

ভাবতে অবাক লাগে, নিজের লেখক হওয়ার সিদ্ধান্তে যিনি এত দ্বিধাহীন, তাঁর সাহিত্য-সাধনার কোন আনুশৈশব চর্চা ছিল না। লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি আচমকাই। বাজি রেখে। যৌবনে পদার্পণ করে। এবং প্রথম গল্পেই বাজি মাৎ। আর প্রথম পদক্ষেপ থেকে সেই যে যাত্রা শুরু, আমৃত্যু কঠিন জটিল দারিদ্র্য-কণ্টকিত সাহিত্য-পথের নির্ভীক পথিক তিনি।

কিন্তু কোন রকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই কি কারো সাহিত্য-জীবন শুরু হতে পারে? এই কি তবে ঈশ্বর-প্রদত্ত সেই প্রতিভার নিদর্শন?

না, এর কোনটিকেই মানেন নি মানিক। প্রথম প্রশ্ন প্রসঙ্গে তাঁর জবাব—'আমি বলব, না, এরকম হঠাৎ কোন লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করিনা। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে···প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। জীবন যাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকার লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।'

আর প্রতিভা? মানিক নিজে শিল্পী সাহিত্যিকের তথাকথিত প্রতিভা প্রসঙ্গে ছিলেন সম্পূর্ণ নির্মোহ। এ প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধাহীন ঘোষণা—'প্রতিভা প্রসঙ্গে সাধারণ লোকের এবং প্রতিভাবানদেরও ধারণা আছে ওটা এক ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিস। প্রতিভাকে এরকম রহস্যময় পদার্থ মনে করার ফলে লেখক-কবিদের এ জিনিসটার ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মে গিয়েছে।···এরকম ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী অবশ্য লেখক-কবিরাই।'

আর এক জায়গায় বলেছেন, 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্ম-জ্ঞানের অভাব রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেননা···মানুষের সমাজে নিজেদের আজ মানুষ বলেই ভাবতে হবে।···আজ তাই লেখক-কবির পক্ষেও দরকার হয়ে পড়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে আর নিজের প্রতিভাকে যাচাই করা। সত্য যেমনই হোক অভিমানে কাতর না হয়ে তা মেনে নিতে হবে। মাথা নিচু করে এই মূল সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা—মানুষ হয়ে জন্মে কারো সাধ্য নেই অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অতিমানব হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ অলৌকিক প্রতিভা নয়, নিজের আত্মবিশ্লেষণে লৌকিক প্রক্রিয়ার ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি। প্রতিটি লেখকের ক্ষেত্রেই যে প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে সাহিত্য প্রসঙ্গে তার তীব্র আগ্রহ, তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। নিজস্ব বাস্তব জীবন ও পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে সঠিক জীবন-দর্শন খুঁজে নেবার চেষ্টা ইত্যাদির নির্ভরে।

নিজের জীবনেও এই প্রক্রিয়াকে 'সংস্কার ও স্বপক্ষপাতিত্ব বর্জন করে' বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন তিনি।

গভীর জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর আশৈশব প্রবণতা। তাঁর নিজের ভাষায়—'ছেলেবেলা থেকে 'কেন' নামক মানসিক রোগে ভুগেছি। ছোটবড় সব জিনিসের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ সে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসেবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলেমানুষেরও সেটা জানা থাক—যতক্ষণ সেটাকে তুলোধনা করে না ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্তে-মাংসে পরিণত করার মত পরিণত না করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই।'

স্বভাবতই এই তীব্র জিজ্ঞাসা নিয়েই পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজস্ব পারিবেশ ও মানুষকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন মানিক। যথার্থ উত্তর খুঁজে না পেয়ে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন। অন্বেষণ আরো তীব্র হয়েছে। তীব্রতর হয়েছে সংস্কার ও চেতনার সংঘাত।

জন্মসূত্রে মধ্যবিত্ত ভদ্রজন তাঁর স্বজন। কিন্তু সেই জীবনের কৃত্রিমতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে চেতনায় বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে। নিচুতলার মার খাওয়া লোকগুলোর প্রতি মমতা রয়েছে, অথচ তাদেরও রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের সংস্পর্শে গিয়ে মানসিক আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেন না।

এই মর্মান্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে মানিকের অকপট বিশ্লেষণ—'ভদ্রজীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আমি হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের বাবুদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা আকাঙ্খা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য মুখোসপরা হীনতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন, অথচ এই জীবন থেকেই মাঝেমাঝে পালিয়ে

ছোটলোক চাষাভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি। আবার এই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁপ ছাড়ি। বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে।···জিজ্ঞাসা জাগতো, তাহলে ব্যাপারটা কি?'

এই পর্যায়ের মানসিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।'

এই জীবন-দর্শন মানিক খুঁজে পেয়েছিলেন অনেক পরে। সে কথা পরে আসছে। এ সময়টা তাঁর জীবন-দর্শন খোঁজার যন্ত্রণা-বিদ্ধ পর্ব।

এ প্রশ্নের উত্তর তিনি পাঠক হিসেবে খুঁজেছেন সেদিনের মুদ্রিত সাহিত্য থেকে)। কিন্তু এ যাবৎকাল রচিত সাহিত্য থেকে খুঁজে পাননি যথার্থ উত্তর।

এ-সময়ে বাঙলাদেশে বাস্তববাদের দাবী নিয়ে কল্লোলযুগের লেখকরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের দাপটে চারদিক প্রকম্পিত। প্রাচীন সব মূল্যবোধ, মধ্যবিত্তের সব মুখোস ছিন্নভিন্ন করে পাঠকদের হকচকিয়ে দিলেন তাঁরা।

কিন্তু এঁদের সাহিত্যেও মানিক তাঁর জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে পেলেন না। তৃপ্তি পেলেন না। বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু ছাত্র মানিক তখনই যৌন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বসাহিত্যের এক তন্বিষ্ঠ পাঠক। তাই এই 'বস্তুহীন' বিদ্রোহী লেখকদের ফাঁকিটা সহজেই তাঁর চোখে ধরা পড়ল। লক্ষ্য করে দেখলেন, সাহিত্যে নিচুতলার মানুষকে তাঁরা আনছেন ঠিকই কিন্তু নতুন কোন জীবন-বোধ আসছেনা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের কলমে। বস্তি খনি কারখানার মানুষকে সাহিত্যে হাজির করিয়েও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবাস্তব ভাবালুতা থেকে তাদের রক্ষা করতে পারছেন না। ফলে নতুন দৃষ্টি আমদানি করতে গিয়ে অনেক লেখকই যৌনতার আবর্তে নিমজ্জিত হচ্ছেন।

নতুন করে আবার অতৃপ্ত মনে প্রশ্ন জেগেছে—'শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না?

এই অতৃপ্তি আর অস্থিরতা থেকেই তিনি সন্ধান করতে শুরু করলেন,

জীবনের রহস্য কী? মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র জটিল সম্পর্কের বীজ কোথায় লুকিয়ে আছে? নর ও নারীর অন্তর্লোকের নিয়ামক শক্তী কি?

সাহিত্য চর্চার প্রথম পর্বে এর উত্তর হিসেবে খুঁজে পেলেন মানিক—যৌন শক্তিকে। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক জৈবিক ক্ষুধাকে। মনোবিকলনের সুড়ঙ্গ-পথের জটিলতার মধ্য দিয়েই তিনি খোঁজার চেষ্টা করলেন মানুষের জীবন-রহস্য।

মানিকের এই পর্বের বিশ্লেষণে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই বলেছেন, 'এর একদিকে আদিম মানুষের রক্তনাড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত মনের সরীসৃপ কুটিলতা। আমার মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তত প্রথম পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুটি শব্দ দিয়েই চিহ্নিত করা যায়—একটি 'প্রাগৈতিহাসিক' আর একটি 'সরীসৃপ'।

কিন্তু মানুষের জীবন-রহস্যের এই সূত্র খুঁজে পাওয়ার পরও যেন তৃপ্ত হতে পারছিলেন না মানিক। তাঁর অন্বিষ্ট, বিশ্লেষণী মন তখনও অনুসন্ধান-রত।

এরপরই ধীরে ধীরে মানিকের দ্বিতীয় পর্বে উত্তোরণ। সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। নানা দিক দিয়ে ইতিহাস এক তীব্র সংকটের মুখোমুখি তখন।

মানিকের পরিচয় ঘটল মার্কসবাদের সঙ্গে। ঝাপসা অনেক কিছুই তাঁর কাছে ক্রমে পরিস্কার হয়ে আসতে লাগল। এবং তিনি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের যন্ত্রণা ও মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়কে এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে প্রয়াসী হলেন তাঁর নির্মোহ মন ও বৈজ্ঞানিক চেতনার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে। গোপাল হালদারের বিশ্লেষণে—'মার্কসবাদ তাঁকে এই শিক্ষা দিল যে, মানুষের যৌন বৃত্তির চেয়েও অর্থনৈতিক শক্তি অধিকতর মৌলিক শক্তি, এবং সমাজের বহির্লোকের মত অন্তর্লোকেরও তা নিয়ামক শক্তি।'

এ প্রসঙ্গে মানিকের নিজেরও স্বীকৃতি—'আমার লেখায় যে অনেক ভুলভ্রান্তি মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয় নি।...মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্

ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে, তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অন্ধ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।'

কিন্তু মার্কসবাদকে তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা ও তার সঠিক প্রয়োগ এক কথা নয়। এ কথা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ক্ষুরধার এই ফলিত-দর্শনটির দু'দিকে দুই বিচ্যুতির আশঙ্কা প্রতি পদক্ষেপে। সে দু'টি বিপদ—সংকীর্ণতা ও অতি উদারতা।

একজন মার্কসবাদী লেখক হিসেবে এ-প্রসঙ্গে সর্বদাই সচেতন ছিলেন মানিক। অথবা থাকার চেষ্টা করতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংকীর্ণতার ঊর্ধে। প্রগতিশীলতার কোন যান্ত্রিক সংজ্ঞায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি।

এদেশের বামপন্থী চিন্তায় বেশ কিছুদিন কতগুলো বিষয়ে একটা স্পর্শ-কাতরতা ছিল। এখনও যে কোন কোন মহলে নেই তা বলা যায় না। সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ তার ভেতর একটি। দ্বিতীয়টি সাহিত্যের নির্বাচিত চরিত্র। শ্রমিক, কৃষক বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামী চরিত্র ভিন্ন অন্য চরিত্রকে তাঁরা প্রসন্ন মনে প্রগতিশীল হিসেবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন।

এই দু'টি ক্ষেত্রেই মানিক ছিলেন সংকীর্ণতার ঊর্ধে। দেহ বা যৌন সমস্যাকে সাহিত্যে স্থান দিতে আদৌ আপত্তি ছিল না তাঁর। বহুক্ষেত্রে নিজেও এনেছেন। কিন্তু আপত্তি ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থে তার বিকৃতি ঘটানোতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—'দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনার নয়—ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা যৌন বিপর্যয়েরও একটা বিপ্লবাত্মক সত্য থাকে। বিপ্লবটা বাদ দিলে যা অর্থহীন'।

এ প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে আপত্তি ছিল সেই সব লেখক প্রসঙ্গে, যাঁরা নিচু তলার জীবন অবিকৃতভাবে তুলে ধরার ভান করে সেই জীবনের যথেচ্ছ যৌনাচারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। শোষণ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর জীবনসংগ্রাম ও যথার্থ পরিবেশ বাদ দিয়ে 'বাবুদের মনরঞ্জনের' জন্য শুধু তাদের যৌন-সম্পর্ককেই প্রতিফলিত করে থাকেন। মানিক একে বলেছেন অশ্লীলতা। ন্যাচারালিজম। 'চাষী মজুরদের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে ব্যবসা চালানো।'

সাহিত্যে প্রগতিশীলতার মাপকাঠি প্রসঙ্গেও তিনি ছিলেন মুক্তদৃষ্টি।

শ্রমিক কৃষকের জীবনের পটভূমি ছাড়া প্রগতিশীলতা হয় না, অথবা সম্মুখ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোদ্ধা না হলেই প্রগতিশীল চরিত্র নয়—এমন কোন সংকীর্ণ বিচার ছিল না তাঁর। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন তিনি, 'চাষীদের জীবনে, জনসাধারণের জীবনে অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে সামনা-সামনি সংঘর্ষ ছাড়া সংগ্রামের আর কোন রূপ নেই, অভিব্যক্তি নেই—এ তো সংগ্রামকেই অস্বীকার করা, সাময়িক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিণত করা। জীবনে ও চেতনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য।'

একজন মার্কসবাদী হিসেবে মানিক অতি-উদারতারও বিরুদ্ধে ছিলেন। সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে এক সময় প্রগতিশীল মহলে কিছু বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু দিন লেখা বন্ধ রাখার পর অচিন্ত্যকুমার হঠাৎ পূর্ববঙ্গের চাষীদের নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। পটভূমি চাষীজীবন এবং চরিত্ররা কৃষক বলেই বোধহয় কিছু প্রগতিশীল পাঠক, সমালোচক সেই লেখায় প্রগতিশীলতার লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন। এ নিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে লেখা শুরু হয়। কবি বিষ্ণু দে একটি সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বলেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচকের নেই। তিনি কৃষক-সভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা তাও জানবার প্রয়োজন নেই।

মানিক তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে ছিলেন পত্রিকার পাতায়। তাতে কোন উষ্মা বা অবিনয় ছিল না। কিন্তু অনমনীয় দার্ঢ্য ছিল। অচিন্ত্য-প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর মত খণ্ডন করে তিনি বলেছিলেন,—'অচিন্ত্যকুমার ভাল গল্প লিখতেন। আজ আরো ভাল গল্প লিখছেন। তাঁর পূর্ণতার বিকাশ হয়েছে। বিকাশ পরিবর্তন নয়। ধারা পরিপুষ্ট হওয়া ধারাবাহিকতাই। সমাজ-ভাঙ্গা জর্জর চাষী জীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসিকান্না আনন্দ-বেদনা প্রেম-বিরহ নীতি-দুর্নীতি কলহ-বিবাদ একতা প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে?'

প্রগতি সাহিত্য-বিরোধী যে কোন প্রচারের বিরুদ্ধেও মানিক ঋজু-কণ্ঠ ছিলেন। প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান অভিযোগ—প্রচারধর্মিতা। এই কুৎসার জবাবে, এটা ত্রুটি মেনে নিয়েও, পরিষ্কার জবাব

মানিকের—'বাংলা প্রগতি-সাহিত্য প্রচার-ধর্মী হয়েছিল জীবন-বিরোধী মিথ্যা আদর্শবাদীতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য। এটা ত্রুটি, বাস্তব-জীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু মিথ্যাকে তুলে ধরার চেয়ে সাহিত্যে প্রচারধর্মী হওয়া ঢের ভালো—সমাজ ও সাহিত্যের রূপান্তর গ্রহণের বিশেষ স্তরে প্রচারধর্মী হওয়াটাই তাই সাহিত্যের প্রগতির লক্ষণ এবং আশার কথা হয়ে দাঁড়ায়।'

কথাটায় জেদের সুর আছে। একে একজন প্রগতিশীলের আত্ম-সন্তুষ্টি বলে ভুল করারও অবকাশ আছে হয়তো। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কোন আত্ম-সন্তুষ্টির বিরোধী ছিলেন মানিক। বরং নিজের এবং নিজ শিবিরের আত্ম-সমালোচনায় তিনি ছিলেন আরো কঠোর, অকুণ্ঠ। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণটি।

এই নির্মোহ, নির্মম আত্মসমালোচনার শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন মার্কসবাদ থেকেই। নিজের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে মার্কসীয় জীবন-দর্শনই অনুসরণ করার দীক্ষা নিয়েছিলেন মানিক। নিজেকে যথার্থই 'শ্রমিক শ্রেণীর একজন' করে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীকেই ষোলআনা বিপ্লবী, সেরা মানুষ বলে ভাবতেন তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মার্কসবাদী জীবন-দর্শন তাঁর সাহিত্যে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে সে-বিচারের দায়িত্ব পাঠক ও সমালোচকদের। কিন্তু নিজের সাহিত্য-সৃষ্টি প্রসঙ্গে এটুকুই মানিকের আত্ম-সমীক্ষা। সৎ বিশ্লেষণ। □

বাঙলার নাট্যকলা ঃ শিকড়ের সন্ধান

সলিল সরকার

বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাস কতদিনের, কতকালের ? এখন নাটক নিয়ে চর্চা করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে এই প্রশ্নটা বেশ আলোচিত। কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা মানেই আমরা ধরে নিতে পারি তার সজীবতা ও সংশয় এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস। যদি অবশ্য কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ধরা যায় – বলা হয় বাঙলা থিয়েটারের বয়স কত ? এখানে থিয়েটার হল theatre —অর্থাৎ বিদেশি শব্দ। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর সন্ধান করেছি আমরা এই-ভাবে—১৭৯৫ সালের শহর কলকাতায় এক রুশদেশবাসী বেহালাবাদক গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ-এর নাট্যপ্রয়াস থেকে। অর্থাৎ বাঙলা থিয়েটার পেরিয়ে এল ২০০ বছর। নানা কর্মকান্ডময় ২০০ বছর। এবং এই ২০০ বছরকে কেন্দ্র করে আজ বাঙলার নগর থেকে গ্রাম যেখানেই নাট্যচর্চা হয় – নাট্যকর্মীরা পালন করছেন নাট্যকলার ২০০ বছর। প্রয়াসটা শুরু হয়েছে ১৯৯৫-এর কয়েকবছর আগে থেকেই। পূর্ববাঙলা অধুনা বাঙলাদেশে হায়াৎ মামুদ এক পরিশ্রমধর্মী গবেষণার মধ্য দিয়ে লিয়েবেদেফের জীবন ও কলকাতায় বাস করার কালে তার নাট্যকর্মকান্ড বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। আর কলকাতার যে অঞ্চলে তিনি নাটমঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন তা এতদিন ছিল অজানা। কেননা ২৫নং ডোমটোলা আজ কলকাতায় অবস্থান করে না। বর্তমান প্রাবন্ধিক অনুসন্ধান করে স্থানটিকে চিহ্নিত করার পর বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানটিতে ফলক বসানোর আয়োজন করেছেন। এইভাবে কেবল লিয়েবেদেফের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়—বাঙলা প্রসেনিয়ম থিয়েটার বা লিয়েবেদেফকৃত নাট্য কর্ম-কান্ডকে সম্মান জানানো হল। বস্তুত এটা লিয়েবেদেফ কৃত বাঙলা প্রসেনিয়ম নাট্যচর্চার ২০০ বছর পার হয়ে আসা। একইসঙ্গে বাঙলা নাট্যকলার শিকড়

সন্ধান ঐতিহ্যের মূল্যায়ন তাও শুরু হয়েছে এই সূত্র ধরেই। তাই এত বাদানুবাদ এত তর্ক আলোচনা।

বাঙলার প্রসেনিয়ম থিয়েটারের ২০০ বছর ছাড়িয়ে যদি একটু পেছনে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে বাঙলার শিল্পকলার ইতিহাসের মতই বাঙলার নাট্যইতিবৃত্ত অতি প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। বাঙলার নাটপালা, নাটগীত, যাত্রা, গম্ভীরা, লেটো, আলকাপ, বোলান, সবই নাট্যের লোকায়ত নাট্যধারার নানাপ্রকাশ। দ্বাদশ শতকে লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের লেখা 'গীতগোবিন্দ' কাব্য হলেও নৃত্য, গীত ও কথনে অভিনীত হত। আর এই 'গীতগোবিন্দ' পরবর্তীতে সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হলেও মূল কাঠামোটি ছিল প্রাকৃত বাঙলায়। চৈতন্যদেবের কালে ধর্মপ্রচারে নাটকের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। চৈতন্য নিজে ছিলেন একজন শক্তিশালী অভিনেতা। সপ্তদশ শতকে বাঙলার বাইরেও বাঙলা নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। নেপালে নেবাড়ি হরফে লেখা বাঙলা নাটপালা। একইসময়ে বঙ্গে (আজকের পশ্চিমবাঙলা নয় কেবল) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কাব্য ব্যতীত নাটপালা লেখায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। 'চণ্ডী' নামে তিনি একটি অসম্পূর্ণ রচনাও রেখে গেছেন। ভারতচন্দ্র তার কাল ছাড়িয়ে কোম্পানির আমলেও বাঙলার সংস্কৃতি জগতে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে—আজআমরা যাকে প্রথম প্রসেনিয়মধর্মী বাঙলা নাট্যপ্রযোজনার সূত্রপাত বলছি তা লিয়েবেদেফ দ্বারা বাস্তবায়িত হলেও তাতে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির পাশাপাশি বাঙলার লোকনাট্য মেশাতে হয়েছিল। লিয়েবেদেফ কোনভাবেই ভারতচন্দ্রের প্রভাবকে এড়াতে পারেননি। তাই অনূদিত নাটকেও এদেশীয় লোকবাদ্য, লোকসঙ্গীত ও লোকশিল্পকে প্রাধান্য দিতে হয়েছিল।

লিয়েবেদেফ ১৭৯৫এর ২৭ নভেম্বর কলকাতার ডোমটোলা অঞ্চলের ২৫ নম্বর ঠিকানায় (বর্তমান ঠিকানা হল ৩৭ এজরা স্ট্রিট) 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে যে নাটমঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন যেখানে অভিনীত হয়েছিল অনূদিত বাঙলা নাটক 'সংবদল'। এই নাটক ও নাট্যপ্রচেষ্টা তৎকালীন ব্রিটিশ কর্মচারী ও শাসকবর্গের প্ররোচনায় স্থায়ী হতে পারেনি এবং লিয়েবেদেফ কেবল থিয়েটার ছাড়তে বাধ্য হন তাই নয়, কলকাতাও ছাড়তে হয় তাকে। যদিও বাঙালি ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ করল এই প্রসেনিয়ম থিয়েটার। প্রথমে এই প্রচেষ্টা রূপায়িত

হল শহর কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়—যাকে আজ চিহ্নিত করা হয় 'বাবু সংস্কৃতি' নামে। ক্রমে এই নাটক সঞ্চারিত হল জনজীবনে। অর্থাৎ লোকনাট্যের ধারা যেমন এল নাগরিক চর্চায় আবার নাগরিক চিন্তাও পাল্টাতে থাকল সাধারণের লোকসংস্কৃতি ও লোকনাট্যধারাকে। অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর এবং গিরিশ ঘোষের উদ্যোগে বাঙালি পেল 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। এর আগেই পেয়েছি রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধুর মতো নাট্যকারদের। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ১৮৬০এ লেখা হলেও ১৮৭২এ এসে গেল সমুচিত সম্মান। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি জাতীয় জেহাদ প্রকাশ নাটকটির মুখ্য প্রযোজনা। বাঙলা থিয়েটারে স্বদেশচেতনা, জাতীয়তাবাদ ও গণআন্দোলন বারে বারেই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশে কালে কালে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রযোজক অভিনেতা, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলালের নাট্যপ্রতিভা শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো অভিনেতা পরিচালকরা এলেন মঞ্চের পাদপ্রদীপে। যে নারীরা এতদিন ছিলেন অচ্ছ্যুত—তাঁরা সেদিন পেলেন সামাজিক সম্মান মঞ্চে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে। এমনকি নাটক লিখেও। বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, রানীবালা, কঙ্কাবতী, প্রভাদেবী কেবল অভিনেত্রীই ছিলেন না—বিনোদিনী যেমন নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন—সুকুমারী লিখেছেন 'অপূর্বসতী'র মতো সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে নাটক।

উনবিংশ শতাব্দে বাঙলার পেশাদারী নাট্যচর্চার পাশাপাশি স্বতন্ত্র আর এক প্রয়াস ছিল ঠাকুরবাড়িতে। বর্ণবিভাসিত পেশাদারী নাট্যকলার পাশে ঠাকুরবাড়ীর নাট্যচর্চা আজও আলোচিত। আর রবীন্দ্রনাথের ভিন্নধারার নাট্যপ্রয়াস, কিংবা অবনীন্দ্রনাথের নাটপালা আজও গবেষণার বিষয়। 'নবনাটক' থেকে ঠাকুরবাড়ীতে যে নাট্যচর্চা শুরু হয় অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণপালা' পর্যন্ত এক দীর্ঘ ইতিহাস বাঙলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেই সমৃদ্ধ করেছে।

চল্লিশের দশকে জন্ম নিল এক নতুন ধারার নাট্য আন্দোলন। প্রগতি নাট্যচর্চার এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল—ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (IPTA)। গণনাট্যের কাজ হল—লোকায়ত শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিক শিল্পের সৃজন। নাচ, গান, নাটক, সাহিত্য, শিল্প সর্বক্ষেত্রেই চলল অনুসন্ধান

ঐতিহ্যের অনুসন্ধান। বিশেষ করে নাটক যেহেতু উৎকৃষ্ট গণমাধ্যম তাই নাটক ও নাট্যচর্চা মাতিয়ে তুলল—গ্রাম-নগর-মাঠ-পাথার-বন্দর-ক্ষেত ও কলকারখানা। গণনাট্য বললেই আজও অনেকে মনে করেন এ কেবল নাটকেরই সংগঠন, কিন্তু তা তো নয়। গণনাট্য সংঘ যত সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সৃষ্টি করেছে, যত নৃত্যশিল্পী, চিত্রকরকে পুনরুজ্জীবিত করেছে তা আজ ইতিহাস।

গণনাট্যের ব্যানারে বিজন ভট্টাচার্যের লেখায় শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যৌথ পরিচালনায়—সাদামাঠা চটের বিন্যাসে মঞ্চস্থ হয়েছিল ঐতিহাসিক প্রযোজনা 'নবান্ন'। 'নবান্ন' এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন। বাঙলা নাট্যকলায় এক নতুন দিকচিহ্ন। এই প্রথম চাষীরা নায়কের মর্যাদা পেল বাঙলা নাট্যধারায়। মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষ মানুষকে কিভাবে হনন করেছে তা বিশ্লেষিত হল মঞ্চে। কালক্রমে আরও কত নাট্যপ্রযোজনা, কত প্রতিভা সম্মিলিত হল এই সংঘের পতাকাতলে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বীরু মুখার্জী, দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম আরও বহু নাম—বহু নাটক, অসংখ্য নাট্য প্রযোজনা আমাদের অর্জিত বৈভব। গণনাট্যের কালে নারীরা পেলেন স্বতন্ত্র মর্যাদা। সংঘের সঙ্গে, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন তারা নিবিড়ভাবে। সহযোদ্ধা হিসাবে, কখনওবা নেতৃত্বদানে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করল। শোভা সেন, মণিকুন্তলা সেন, তৃপ্তি মিত্র, রেবা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, গীতা সেন, সুচিত্রা মিত্র এঁরা কেবল নাচ, গান ও নাটকেই পারদর্শিতা দেখালেন না—এঁরা তখন সংগঠক হিসাবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গণনাট্য আন্দোলনের পাশাপাশি জন্ম হল এক নতুন ধারার থিয়েটার—Group Theatre হিসাবে আজ যা চিহ্নিত। তিরিশের দশকে আমেরিকায় Federal Theatre Project-এর অনুসরণ করে এদেশে গ্রুপ থিয়েটার সমাজ চেতনায় ব্যাপকতা আনার লক্ষ্যেই মঞ্চে আনল নতুন বিন্যাস। এরজন্য তৎকালীন গননাট্যের কিছু মত ও পথ এবং ব্যক্তির জনপ্রিয়তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা দায়ী। গ্রুপ থিয়েটার করতে এলেন যাঁরা জনপ্রিয়তা পেলেন অচিরেই। শম্ভু মিত্র হলেন এই নবনাট্যধারার পথিকৃৎ। উৎপল দত্ত চিহ্নিত

হলেন 'Political Theatre' বা 'Propaganda Theatre'-এর প্রবক্তা হিসাবে। পাশাপাশি আরও বহু নাট্য পরিচালক। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তকে মর্যাদা দিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বতন্ত্রবোধে।

বিস্ময়ের হলেও সত্য—বাঙলায় অর্থাৎ শহর কলকাতা থেকে প্রতিটি মফস্বল এমনকি গ্রামগুলিতে সারা বছরে যত নাট্যদল যত নাটক মঞ্চস্থ করে তা বিশ্ব নাট্য অঙ্গনে বিরল। এখানে নাট্যদল কয়েকহাজার, নাট্যপ্রযোজনা কয়েক শ। শহর ও শহরমুখী নাট্যদলের কথা বহু আলোচনায় এসে পড়ে। কিন্তু প্রতিযোগিতা মঞ্চে যে হাজার হাজার নাট্যকর্মী প্রতিদিন ট্রেনে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে হাতে মালের বোঝা নিয়ে ছুটে চলেছে হালিশহর থেকে হালতু কাঁচরাপাড়া থেকে কাকদ্বীপ, ফুলিয়া থেকে ফারাক্কা, আসানসোল থেকে আন্দুল তারাও নাট্যআন্দোলনকে নতুন নতুন প্রাণশক্তি সরবরাহ করছে। হাজার দৈন্য, হাজার অসঙ্গতি নিয়েই তারা কেউ বেকার কেউ সামান্য কেরানি, কেউ বা ছাত্রছাত্রী, তবু তারা মরিয়া হয়ে একটাই কাজ করছে—নাট্যচর্চা।

তাই বাঙলার নাটমঞ্চের ইতিহাস, নাট্যকলার ইতিহাস সংকলিত করতে হলে এদের কথা বলতেই হবে। বাঙলার নাট্যকলাকে চিহ্নিত করতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে বাঙালির দিনযাপন—সামাজিক ও রাজনৈতিক দিনলিপি, সর্বোপরি কালে কালে গঠিত ও অবলুপ্ত মঞ্চের সঙ্গে জড়িত মানুষ-জনের ইতিবৃত্ত।

আর এইভাবেই কোন একদিন বাঙলার নাটমঞ্চ-নাট্যকলার ইতিহাস চিত্রণ সম্পূর্ণতা পাবে সমচিন্তার সংশ্লেষণে।

বাঙলা প্রসেনিয়ম থিয়েটারের ২০০ বছরে যা অনিবার্য প্রয়োজন। □

সাতপুরুষের গোরস্থান

বিষ্ণু বিশ্বাস

সতীশ মাস্টার ক্লাবঘরে বারান্দার বেনচির উপর বসে পা নাচাচ্ছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মুকুন্দ, ভগ্গ, ধনা এবং কুচোকাচা আরো অনেক কটাই। গত দিন-পনেরো ধরে ক্লাবঘর জমজমাট। অন্যসময় ক্যারাম তাস টুকটাক চলে। এখন বিশ্বকাপের সিজিন—শচীন লারাদের আলোচনায় ক্লাবঘরের হাওয়া গরম সকাল নটা থেকেই। তার উপর আজ বিকেল থেকে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ। গরম হাওয়ার লু বইছে। সাড়ে এগারোটার স্টেটবাসে খবরের কাগজ নামবে নাজিরপুর বাজারে। এখানে আসতে আসতে কম করে বারোটাতো বটেই। এতক্ষণ পর্যন্ত চিলচিৎকারে কাক পর্যন্ত ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না আশেপাশে। খুব সহিষ্ণুপ্রাণী বলে একটা ঘুঘু সজনে গাছের বাসায় এতক্ষণ একরাশ বিরক্তি নিয়েও বসেছিল আর মাঝেমধ্যে ঘাড় নামিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল মানব সমাজে অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটবার উপক্রম হল কিনা।

ভগ্গর কথা বার্তার ছিরিছাঁদ দেখে পিত্তি জ্বলে যায় সতীশের। অ্যাতো লারা লারা করার আছেটাই বা কী? ঐতো আগের খেলাটায় বারো রানেই কেলিয়ে পড়ল। আমাদের অমন সোনার চাঁদ শচীন থাকতেও লারাকে নিয়ে হ্যা হ্যা করলে মাথা গরম তো হবেই। ভগ্গ একটু আগে লারার স্কোয়ার কাটের প্রসঙ্গ তুলেছিল। হুঁ, ভারী তো স্কেয়ার কাট। সতীশ সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গি গুটিয়ে মালকোচা মেরে উঠে দাঁড়াল তড়াক করে তারপর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদের শচীন কেমন ড্রাইভ মারে। ধনা বলল, সতীশদা, তুমি ক্রিকেট খেললে কিন্তু অনেক দূর উঠতে। গলাটাকে যতটা—সম্ভব খাদে নামিয়ে সতীশ বলল, কেন আমি খেলিনি নাকি? আমি যখন খেলা ছাড়ি ভগ্গ তখনো ছুঁচু করতেও শেখেনি। মালোপাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে একটা ম্যাচে আমি একাই বাহাত্তর রান করেছিলাম। আমার রেকর্ড

এখনো কেউ ভাঙতে পারিস নি। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ঘুন্সা কুইমালিকে জিগ্যেস করিস।

করিম মোল্লা বাচ্ছিল ক্লাবের সামনের রাস্তা দিয়ে। সতীশ ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে হাঁক পাড়ে, কিরে করিম আজ তো তোদের বাড়ী বড় গোস্ত। মুকুন্দ ধনারা হিঃ হিঃ করে হাসে। করিম হাঁটা থামিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে। হঠাৎ বড়গোস্তের কথা ওঠে যে! প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় বাস করে দাড়ি পাকিয়ে ফেলা করিমের সজাগ কানে মোটেই ভাল ঠেকল না কথাটা। সেই যেবার ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বাধল তখন একদিন সতীশের বাবা বিলাস বিশ্বাস লোক পাঠিয়ে কাছারিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাফ বলে দিয়েছিল, দ্যাখ করিম মহম্মান আছিস ঠিক আছে—কিন্তু নেমকহারামি কল্লে পাচায় নাতি মেরে ওপারে পাঠিয়ে দেবো। আমার নাম বিলাস বিশ্বিস।

করিম তখনো এতো পোক্ত হয়নি। কিছু বুঝতে না পেরে হাত কচলাতে কচলাতে বলেছিল, এজ্ঞে এসব কী বলছেন বিশ্বিস মশাই! নেমকহারামি করবো ক্যানে?

—মেরজাফরের জাত নেমকহারামি করবিনি। আমার কাছে সব খবর আছে। আগে বল তোদের পাড়ায় কেন পাকিস্থান রেডিয়ো বাজে? ভাবিস কেউ কিছু টের পায়না? থানায় গিয়ে রিপোর্ট করে দেবো। তোদের সবকটার নামে। দেখিস্ কেমন আছোলা বাঁশ ঢোকায়।

—এজ্ঞে সনঝেবেলা বুড়ো বেলতলায় বসে পাড়ার সবাই রেডিয়ো শোনে। সামসেরের বাপ লতুন রেডিয়ো কিনেছে। কাজকাম সেরে সবাই একটু গল্পটল্প করি গানটান শুনি। কোলকাতাও শুনি ঢাকাও শুনি। অন্য কিছুতো আমরা শুনিনি এজ্ঞে। লোকগীতিটাই বেশী শুনি। ঢাকা থেকে আব্বাস বলে একজন লোকগীতি যা গায় আপনারও এজ্ঞে দিল জুড়িয়ে যাবে যদি শুনেন কখনো।

বিলাস বিশ্বাস দাঁতে দাঁত চাপে, অ্যাঃ আব্বাস মারাতে এয়েছে এখেনে! অ্যাতো পিরিত কিসে। জাত ভাই বলে? ঘুঘু দেখেছো ঘুঘুর ফাঁদ দেখোনি। তলে তলে যুদ্ধের খবর নিস্। পাকিস্তানের এজেন্ট তোরা।

করিম কী বলরে বুঝে উঠতে পারেনা—পাকিস্তানের এজেন্ট হলেই বা

কী করতে হয় তাও জানে না। মুখ নীচু করে চলে আসছিল। বিশ্বেস মশায় গলা তুলে বলল, চল্লি যে কিছু না বলে। ঐ ওটার কী কল্লি? আমি তো আর এমনি এমনি নেবো না। যা দাম হয় তাই পাবি।

যুদ্ধের মাঝপর্বে সেবার শিয়ালমারির ডোবাটা বিলাস বিশ্বেসকে রেষ্টি করে দিতে হয়েছিল। নামেই বিক্রি—দাম যা পেয়েছিল তাতে দশকাঠা আচোট জমিও হয় না। ডোবাটা বড় করে কাটিয়ে বিশ্বেসরা পুষ্কুরণি বানিয়েছে। মুগেল কাতলার পোনায় এখন গিজগিজ করছে সেই পুষ্কুরণি।

তো সতীশমাস্টারের মুখে বড় গোস্তর কথা শুনে গা ছমছম করে করিমের। মনের ভাব গোপন রেখে হাসি আনে জোর করে।

—কী যে বলেন মাস্টার। বড় গোস্ত সেই কবে ছেড়ে দিয়েছি। সে যারা খায় তারা খায়। আমাদের এখেনে ওসব অনাচার হবার জো নেই।

করিম কেটে পড়ার তাল করছিল। মুকুন্দ কথা বাড়ায়, আজকের খেলায় কাকে ছাপোট কচ্ছো গো চাচা?

—আমাদের আবার ছাপোট। এই মাটে নামছি ফিরবো ধরো সেই সনঝেবেলা। ছাপোট করার সময় আছে?

—বাজে কতা বোলো না চাচা। তোমাদের পাড়ায় রোজ রেডিয়োয় রিলে বাজে। বুড়োবেলতলায় ছেলেবুড়ো সবাই গোল হয়ে ঘিরে খেলা শুনছে আমি নিজের চোকে দেখে এসেছি।

অসহায় গলায় করিম জবাব দেয়, সেসব আনু মুল্লাদের মতো ছেলে ছোকরার কারবার। ন্যাকাপড়া শিখে পান্ডত হয়ে গেছে না—অ্যাকুন মাঠান কাজে লজ্জা করে বাবুদের। রাতদিন ঐ রেডিয়ো পাচায় নিয়ে বসে আছে। আমি বলি যারা খেলছে তারা তো শুনি নাক নাক টাকা পায় আর তুরা বেটা আকামের বলদ তাদের মাতায় নিয়ে নাচানাচি করে কী পাস। আমার কাছে ন্যায্য কতা।

করিম দ্রুত মাঠের দিকে পা বাড়ায়। সজাগ কানে ধনার টিপ্পনী তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে—বুঝলে কিনা সতীশদা আগেরবার বিশ্বকাপে পাকিস্থান চ্যামপেন হয়েছিল তো তাই খুব রস হয়েছে।

গোটা পথটা মনে মনে গজগজ করতে থাকে করিম মোল্লা। আনুদের উপর খুব রাগ হয়ে যায়। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে তুরা কেন থাকিস?

তোদের আর কোন কাজকাম নাই! অ্যাকুন এই নিয়ে একটা ইয়ে বেঁধে যাক আর কী। চান্দিকে অ্যাতো গোলমাল হচ্ছে শুনেও তোদের হুঁশ নাই।। গজগজ করতে করতে করিম পাঁচ বিঘের দাগে পৌঁছে যায়। মনটা এখন আবার ভাল হয়ে গেল। ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় স্যালোর পানি পৌছে যাচ্ছে। দুধ জমছে শীষে। গভীর মমতায় ঈষৎ ঝুকে ধানের গাছে হাত ছোঁয়ায় করিম। দুই পাতার ফাঁকে মুখ নিয়ে গিয়ে সন্ধান নেয় মাজরা পোকা বাসা বাঁধছে কিনা। এই জমির কাদা, ধান রোয়া থেকে দুধের জোয়ার প্রতিটি নির্মাণে রয়েছে তার কড়া পড়া আঙুলের কোমল স্পর্শ। জমিতে জমা পানির সঙ্গে ধানের দুধ আর দুধের সঙ্গে শরীরের মধ্যে কুলকুল করে বয়ে চলা রক্তধারার গভীর যোগসূত্র টের পায়। সেই সূত্রের উপর কোথাও দুষ্ট জাব পোকারা ডানা মেলে বসতে না পারে তারই সন্ধানে ধানের পাতা দুহাত দিয়ে মমতায় সরিয়ে দাগের মাঝ বরাবর হেঁটে যায় করিম। যখন খুব ছোট্ট, নাজিরপুর থেকে ভায়া নতিডাঙ্গা করিমপুরের রাস্তায় তখনও ইঁট পড়েনি, পালচৌধুরীদের কাছারি তৈরী হচ্ছে সবে, ওঠাওঠির কথা মনের মধ্যেও উঁকি দেয়নি কারো তখন আব্বার সাথে এই পাঁচ বিঘের দাগে আসতো। তখন ডিপটিকল ছিল না, স্যালো ছিল না, এত হাজার কিসিমের ধানের চারা ছিল না। হাওয়ায় দুলতো আমন ধানের নবীন চারা—আব্বার সাদা দাড়ি উড়তো। আজ যেখানে করিম দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে—গর্ভবতী জমির মাঝবরাবর দাঁড়ালে রুখা মেজাজের আব্বার কঠিন মুখ আস্তে আস্তে পালটে যেতো। করিমকে কাছে ডেকে নিয়ে গল্প শোনাতেন—তাঁর ছেলেবেলার গল্প। ভাদরমাসের শেষাশেষি নবাব দাঁড়া কেটে দিলে হুহু করে জলঙ্গীর পানি ঢুকতো ঠাঙামারির বিলে। ঠাঙামারি ছাপিয়ে সেই পানি একটু একটু করে জমতো এই নাবাল জমিতে। আমন ধানের গোড়ায় গোড়ায় খলবল করে উঠতো চ্যাং সিঙ্গি আর খলসে। পাঁচবিঘের দাগ নিয়ে বড় গর্ব ছিল আব্বার। করিমেরই বা কম কিসের! পানি কাদায় মাখামাখি পাঁচ বিঘে দাগের মাটি তার দশ আঙুলে জড়িয়ে যায়। এই জমিতে আব্বার মেহনতের গন্ধ মাখা আছে। বড় ভালবাসার মাটি। বড় নরম।

বিশ্বিস পাড়ায় খুব বাজি ফুটছে চড়াম চড়াম করে। দখিনে ঘোষ পাড়া থেকে হাউই উড়ল। করিম মোল্লা রাতের খাওয়া সেরে হুঁকোয় শেষ টানটি মেরে তক্তপোষে কাত হয়েছে কেবল। আনু এসে খবর দিল ইণ্ডিয়া জিতে গেছে আব্বু।—হুঁ, তোদের শুধু খেলা আর খেলা। তাও যদি খেলার মতো

খেলা হতো কতা ছিল। আমাদের কালে এই দিনভর খেলার কথা কোনোদিন শুনিনি বাপু। তখন ছিল মরদের খেলা। নারানপুরে হাইইস্কুলের মাঠে বলখেলার শিল্ড ছাড়া হতো। দশ খানা গাঁয়ের লোক ভাঙতো সে খেলা দেখতে।

ঢাকঢোল কাঁসর নিয়ে শোভাযাত্রা বার হয়েছে। এ পাড়ার দিকেই আসছে মনে হচ্ছে। আনু দাওয়ায় গিয়ে কান পেতে গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করে। তক্তপোষের উপর উঠে বসে করিম। সকালে মাঠে যাবার কালে সতীশ মাস্টারের কথাগুলি মনে আসছে। ধনা মুকুন্দদের মুখগুলি মনের উপর জড়ো হচ্ছে একে একে। গোল্ড হিঃ হিঃ, পাকিস্তান হিঃ হিঃ, ছাপোট হিঃ হিঃ। সবুজ ধানক্ষেত রাতের অন্ধকারে এখন জমাট কালো। মাটি চোঁ চোঁ টেনে নিচ্ছে সাঁঝের পানি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে করিমের।

শোভাযাত্রা করিমের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে। ঢোলক বাজছে, কাঁসি বাজছে সেই সঙ্গে তুমুল জাকার 'হায় হায় একি হ'ল মিয়ারা হেরে গেল।' বুড়োবেলতলার মাচার উপর একটি বাজি পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। করিম ঘুলঘুলি দিয়ে দেখল বুড়োবেলতলা একেবারে ফাঁকা। সামনের মুন্নারা অনেক রাত অবদি মাচায় বসে গুলতানি মারে। আজ কোথায় কে জানে। আনু সেই যে ইণ্ডিয়া জেতার খবর দিতে এসেছিল তারপর আর তল্লাটে নেই। শোভাযাত্রা থেকে কার গলা পাওয়া গেল, সুন্দির ব্যাটারা সব পালিয়েছে। সতীশমাস্টার হাঁক পাড়ে, কিরে করিম ঠিক আছিস তো? জবাব দিতে গিয়ে নিজেকে নিঃসাড় ঠেকছে করিমের। প্রাণপণে গলায় জোর আনে, হাঁ মাস্টার। সঙ্গে সঙ্গে সকালের মতো সেই তীক্ষ্ণ হাসি সাতফলা কোঁচের মতো ছুটে আসে হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। শরীর কাঠ হয়ে আসে।

ভারত সেমিফাইন্যালে উঠেছে তাও আবার পাকিস্তানকে হারিয়ে। ক্লাবঘর এখন আরো জমজমাট। ধনার চোখে তখনও আতঙ্ক—কী বলবো সতীশদা, ওই বুড়ো হাড়ে মিয়াদাদ যা খেলছিল কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল সর্বাঙ্গে। আমি ভাবলাম আবার বুঝি শারজা হয়ে যায় আর কী। ভঙ্গ সায় দেয়, মিয়াদাদ একজন কমপ্লিট ব্যাটসম্যান, আট হাজারের ওপর রান আছে টেস্টে—ইয়াকি না। সতীশ মাছি তাড়ানোর মতো বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল ঘনঘন নাড়িয়ে ভঙ্গকে থামায়—দেখ ভঙ্গ আমাকে ক্রিকেট শেখাতে আসিসনে। মিয়াদাদও ব্যাটস্‌ম্যান চামচিকেও পাখি। ওর বত ক্যারদানি সব পাকিস্থানে আর

শারজায়। ছিনাথের বাপ্পার দেখে পালাবার পথ পায় না সে আবার ব্যাটস্‌ম্যান। হুঁঃ।

সতীশ মাস্টার সত্যিই ক্রিকেট পাগল মানুষ। ভারত জিতলে নশ্বর দোকান থেকে লজেন্স আনায়। পাকিস্তানের সঙ্গে জিতলে আনন্দে কী করবে মাথার ঠিক থাকে না। সেদিন কুণ্ডুদের দোকান থেকে মিঠাই আর খুরমা আসে। দেশকে কত ভালবাসে নিজের মুখেই শুনিয়ে দেয়। খুরমা চিবোতে চিবোতে ধনারা সাবাশ দেয়। ভঙ্গর ওপর সতীশের খুব খার—দেশের খাবি দেশের পরবি আর বাইরের পিলিয়াড়দের গীত গাবি! সিদ্ধেশ্বরী তলা প্রাইমারির হেড মাস্টার সতীশ। বিশ্বকাপের সিজিন শুরু হতে মাস্টারি-টাস্টারি শিকেয় তুলে রেখেছে। সকালে একবারটি হাজিরা দিতে ইস্কুলে যেতে হয়। তা না হলে দেখতে খারাপ লাগে। তারপর সেকেন মাস্টারের ওপর দায়িত্ব দিয়ে ক্লাবে চলে আসে। সাড়ে তিনটের সময় আবার গিয়ে ছুটি করিয়ে তবে দায় খালাস। বিশ্বকাপের সিজিন ছাড়াও সারা বছরই কিছু না কিছু কাজকাম লেগেই আছে। শুধু ইস্কুল নিয়ে পড়ে থাকলেই তো আর হ'ল না। পাঁচটা লোক নিয়ে চলতে হয়, সমাজের ভালটা মন্দটা দেখতে হয়। তাছাড়া বাপঠাকুরদার আশীর্বাদে জমি জিরেত নেহাৎ কম নেই। দেখে শুনে না নিলে কিছুই থাকে না। আজকালকার মুনিষগুলোর ধান্দাই হ'ল শুধু ফাঁকি দেওয়া। দু'সার করে পাট নিড়োবে আর জিভ বার করে দম নেবে। ইস্কুলের ছোঁড়াদের পড়া মুখস্থ করতে দিয়ে ছাতা মাথায় আলে দাঁড়িয়ে মুনিষ খেদাতে হয়। অবলা জীব কথা বললে শোনে -- মানুষগুলোই হয়েছে হাড়বজ্জাত। দিনকালের যা গতিক অ.বাদ তুলে দিতে হবে। বাবা তখন বুদ্ধি করে এম. এল. এ কে ধরে মাস্টারিটা করে দিয়েছিল তাই মাসে মাসে বাঁধা হাজার তিনেক আসছে। আজ কত বি এ এম. এ পাশ সব বসে বসে চুষছে।

আজ আবার ভারতের খেলা—সেমিফাইন্যাল। করিম ক্লাব ঘরের সামনের রাস্তাটা এড়িয়ে গেল। ষণ্টিগাছের গোড়া ঘেঁষে যে সরু রাস্তাটি পুব মাঠে সটান নেমে গেছে আজ সে রাস্তা ধরে এগোয় করিম। ষষ্টিগাছের তলায় আসতেই পা ভারী হয়ে ওঠে। এক সময় জায়গাটি জমজমাট ছিল। এখন বড় নির্জন। ছেলেবেলার অনেকটা সময় কেটেছে এখানে—জনশূন্য ষষ্টিতলায় সংগীহীন বনমোরগের মন খারাপ করা ডাকের মধ্যে নিজের ছেলেবেলার একাংশকে খুঁজতে চায় করিম। এইখানে মাটিতে চৌকো চৌকো ঘর কেটে ফুল

খেলতো। ষষ্টিগাছকে সাক্ষী রেখে ছুমন্তর খেলেছে কত পড়ন্ত বিকেলে। হেঁদুদের কত রকমের ষষ্টিপুজো—সব হতো এই পাকুড় গাছের তলায়। নককি পিসি বাতাসা ছড়াতো—কোঁচড় থেকে মুঠো মুঠো বাতাসা নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বলতো, এ্যাই ড্যাকড়া ছোড়ারা যে যা পারিস ধরে খা। বাইন, তেলী আর ঘোষেদের বাড়ীর ছেলেপুলের সঙ্গে করিমও লাফাতো সেই বাতাসা ধরার জন্যে। ষষ্টিপুজো সেরে তেল হলুদ মাখা সুতো সব ছেলেদের ডান হাতে বেঁধে দিতো নকুকি পিসি। একবার করিমকে দেখিয়ে কে একজন বলেছিল, ও পিসি ও ছোঁড়াতো মছুমান—মছুমানের হাতে ষষ্টির সুতো বাঁধলে যে! ঝনঝনে গলায় পিসি বলেছিল ছোট ছেল্যাডা আবার মছুমান হেঁদু কির‍্যা। সবগডাই আমার মা ষষ্টির ধন।

নকুকি পিসি আজ নেই। ষষ্টিগাছটা থেকেও নেই। করিমের বুকের ভিতর থেকে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস নেমে এসে ষষ্টিতলায় এলোমেলো বাতাসে মিশে যায়। সতীশ মাষ্টার হঠাৎ একদিন ষষ্টিগাছের গোঁড়া বেড়া দিয়ে ঘিরে নিল! বলল, এ গাছ আমার এরিয়ায় পড়েছে। বিশ্বাস না হয় রেকর্ড দেখে নাও। দু' একজন মিনমিন করে বলার চেষ্টা করেছিল, অ্যাদ্দিন ধরে এখেনে ষষ্টিপুজো হয়ে আসছে আর অ্যাকুন…।

—সে আমার ঠাকুরদা অ্যানাউ করেছিল। আমি তো নাও করতে পারি। আমাদের ফেমিলি গাঁয়ের জন্য কম করেছে? বদলে গাঁয়ের লোক হুড়কো ছাড়া আর কোনটা ঠেকিয়েছে আমাদের জন্যে? বিদ্যাসাগরের মতো মানুষকেও তাই বলতে হয়েছিল যেচে পরের উপকার করতে যেয়োনা।

রেকর্ড কেউ দেখেনি, দেখতে চায়ওনি! সেটেলমেণ্টের বাবুরা জরিপে এলে বিশ্বিস বাড়ীতেই উঠাবসা করে—আজ তিন পুরুষ ধরে দেখে আসছে গাঁয়ের লোকেরা। জরিপ এলেই পাঁঠা পড়ে বিশ্বিসদের কাছারিতে। বিলাস বিশ্বিসের হাত যশ করিৎকর্মা পুত্র সতীশের সৌজন্যে বেড়েছে বই কমেনি।

মাঠ থেকে ফেরার সময়ই করিম দেখেছে বুড়ো বেলতলা জমজমাট। সামসের মুন্সা আনুরা রেডিয়ো শুনছে। রাতের খাওয়া সেরে তক্তাপোষে কাত হওয়ার সময় টের পেল বুড়োবেলতলায় উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে। আরো অনেকেই এখন এসে জড়ো হয়েছে—ছেলে ছোকরাদের ভিড়ে হাজি সাহেবের মতো আধবুড়োদের গলা টের পাচ্ছে করিম। ওদিকে বিশ্বিস পাড়া, ঘোষ পাড়া, মালোপাড়া সব শুনশান। গতিক ভাল ঠেকছে না করিমের।

বিলের দিক থেকে দফায় দফায় ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এলোমেলো করে করিমের ভাবনার খোলাপ্রান্তর। বুড়ো বেল গাছটা দাদি লাগিয়েছিল কত বছর আগে। শেকড় গেছে কত গভীরে অহেতুক এইসব ভাবতে ভাবতে ঘোর এসে গেল। ছেলেবেলায় কেষ্টযাত্রায় ছিদাম সেজে তিন তিন খান মেডেল পেয়েছিল। গড়াই বাড়ী পোষ পালায় পিঠে খাবার ডাক। নন্দ উৎসবে তালের বড়া সুবল গায়েনের আখড়ায়। বুকের বাঁদিকে কড়া যন্ত্রণা—সারা শরীর ঘামছে। বিলের হাওয়া আর ঢুকছে না। বুড়ো বেলতলায় একটু বাদেই তুমুল হৈ-চৈ। আনু লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল।

—আজ বিশ্বিস পাড়াকে জবাব দিতে হবে আব্বু। পরশুদিন শালোরা খুব জ্বালিয়েছিল। দু' ডজন চকলেট বোম কিনে রেখে ছিলাম আজকের জন্যে।

—খবরদার আনু। মেরে ফেলব একেবারে।

দম নেয় করিম। একটু হাওয়া পেলে ভাল হতো।

—মাটির সঙ্গে নেমক হারামি করিসনে বাপ।

করিমের গলা ঠাণ্ডা অস্পষ্ট। আনু থমকে দাঁড়ায়।

—তুমি কিছু বলছো আব্বু?

বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা। হাত দিয়ে যন্ত্রণা চেপে ধরে আনুকে ডেকে তক্তপোষে বসায়। পুণ্যিপুকুরিণির শেতল পানিতে ডুব দিয়ে উঠে যষ্টিগাছের গোড়ায় হাফ ছেড়ে যেন মরতে পারি বাপ। তখন আমাকে মাটি দিস বামনীঠাকরুণের মাঠের ধারে আমার সাতপুরুষের গোরস্থানে।

দু'চোখ বুজে আসতে চায় করিমের। জেগে থাকে শুধু আম্মার রক্ত চোখের পানিতে মাখামাখি উঠোনের এই স্থান থেকে সাতপুরুষের গোরস্থান। □

গরম খবরের মিশ্র অনুভবে মুখগুলো দেখার মতন হয়ে উঠল। একসাথে বেজে উঠল সবগুলো সুর বিভিন্ন সপ্তকে।

—অ্যাঁ এতক্ষণ চেপে ছিল···

—রিনি আগে তো বলিস নি! খাওয়াতে হবে কিন্তু।

—না না এখানে নয়, বাড়িতে। ভরপেট খাওয়া।

—বাবা রিনি, তোরও ফোন এসে গেল! বাকি রাস্তাটুকু ফোন সংক্রান্ত আলোচনাই চলল।

অফিসে বসেও দেবাঞ্জনের ছবি আঁকা শেষ হল না। রিনি বাড়িতে একলা হয়ে কি করছে? সারাক্ষণ টেলিফোনের কথাই ভাবছে? যেন টেলিফোন ছাড়া তার আর দ্বিতীয় সত্তা নেই। বিয়ের আগে শুনেছিল রিনি অসম্ভব ভালো ছবি আঁকতে পারে। মুগ্ধ হবার মতন ওর গানের গলা। তন্বী রিনিকে দেখতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল ও যেন উধাও ধানক্ষেতের আলপথ ধরে ছুটে চলে যেতে পারে অনেক অনেক দূরে। এখন এমন আভিজাত্য রক্ষার খেলায় কেন যে মেতে উঠেছে রিনি!

সপ্তাহখানেক ধরে বেজে বেজে টেলিফোনের শব্দ অনেকটাই অভ্যস্ত জীবনের অঙ্গীভূত হল। ছোটদিদা, সেজপিসিদের ফোনে খবর নেওয়ার উৎসাহ খানিকটা স্তিমিত। মাঝে মাঝে দেবাঞ্জন অনুরোধের গলায় রিনিকে বলেছে—

—খুব একটা দরকার না থাকলে বিশেষ ফোন কোরো না রিনি। বেশি বিল হয়ে গেলে অনেক টাকা লাগবে। অফিস থেকে তো সবটা পাওয়া যাবে না। খুব চাপ পড়ে যাবে। অমনি অভিমানে আহত রিনির মুখ কালো।

—বাঃ, আমিই যেন একলা সব ফোন করি। তাহলে বাড়িতে টেলিফোন থাকাই বা কেন?

—আহা; আমি কি তাই বললাম!

বলে অপ্রস্তুত মুখে দেবাঞ্জন চুপ করে যায়।

আসলে দেবাঞ্জন বেশ ভীতু-স্বভাবের সাবধানী মানুষ। চারদিকের সমস্ত গণ্ডগোল, সম্পর্কের সবরকম জটিলতা অতি সন্তর্পনে জোড়াতালি দিতে দিতেই প্রায় চল্লিশে পৌঁছে গেল সে। খড়্গপুর আই. আই. টি-র র‍্যাগিং-এর ঝড় সহ্য করে এই দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য যে কি করে সেখানে টিঁকে ছিল তা-ও ওর পরিচিত সকলের বিস্ময়। এই যেমন এখুনি রিনিকে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে চুপ করল—যেমন দেশের বাড়িতে একলা থাকা বিধবা মাকে

শুধু টাকা পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করে অপরাধ বোধের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতেও দিনের পর দিন পার করে দিচ্ছে। যেমন মায়ের হাতের রান্নার সুঘ্রাণ নাকে নিয়ে রিণির প্রেসার-কুকারের দায়সারা ফ্যাকাশে একঘেঁয়ে রান্না খেয়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। দেবাঞ্জন শুধু আপোস করতে পারে। রেগে উঠে তর্জনী তুলে চেঁচিয়ে উঠতে পারে না।

সুন্দরী রিণির প্রেমে বিয়ের দিন থেকেই মজে ছিল দেবাঞ্জন। পিসিমার ঘটকালিতে সম্বন্ধ করা বিয়ে। অপ্রত্যাশিত ভাবে রিণিকে পেয়ে দেবাঞ্জন বর্তে গিয়েছিল। চোরা স্রোতের মতন ভালো লাগা বয়ে যাচ্ছিল মনের মধ্যে। অথচ প্রথম রাতেই রিণির বাঁকা চোখের অবজ্ঞার চাউনি ওর দীর্ঘ ঈষৎ কুঁজো চেহারাটাকে কুণ্ঠায় কুঁকড়ে দিয়েছিল তবু অমন সুন্দর দু'টো চোখ, অপরূপ মুখশ্রী তাকে নিজের অজান্তে অবশ করে ফেলেছিল। রিণির একটা হাত ধরতেই ও চোখ কুঁচকে জানিয়েছিল—

—হাত ছাড়ুন। পুরুষমানুষের হ্যাংলামি সহ্য হয়না আমার।

দেবাঞ্জনের সমস্ত শরীর এক নিমেষে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছিল। অপমানের তপ্ত হাওয়া দু'কানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত শরীর আগুন করে তুলেছিল। কোনো প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি ছিল না দেবাঞ্জনের। এরপর ওকে ইচ্ছেমতন থাকতে দিয়ে দেবাঞ্জন স্বভাবসিদ্ধ ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থেকেছে নিরন্তর। গোলমাল করে কেলেঙ্কারি বাড়ানোর স্বভাবই নয় ওর। একাজে সেকাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে আড়চোখে রিণির মুখ লক্ষ করত দেবাঞ্জন। বিদ্বেষ, অহঙ্কার নয়—কেমন এক নির্লিপ্তি ছেয়ে থাকতো ওর সুন্দর মুখে। তারপর দেবাঞ্জনের অসীম ধৈর্যের তপস্যায় ধীরে ধীরে রিণি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। নির্লিপ্তির কুয়াশা ফিকে হয়ে প্রথম সূর্যের স্বর্ণাভা দেখা দিল। এককাপ চা নিয়ে কাছে আসা, দু'টো একটা টুকরো কথাবার্তার বিনিময় থেকে রাতের শয্যায় অবশেষে ওকে কাছে পেল দেবাঞ্জন। অতীত জীবন নিয়ে কোনো অযাচিত কৌতূহল কখনও দেখায়নি ও। নতুন বিয়ের কোনো উচ্ছ্বাস নয়, হনিমুনের জোয়ারে ভাসা নয়—একটু একটু করে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়তে গড়তে যে রিণিকে চিনল দেবাঞ্জন সে খুব স্ট্যাটাস সচেতন মেয়ে। সাধারণ ছিমছাম ঘর, মধ্যবিত্ত টানাপোড়েন পছন্দ নয় রিণির। একটা টেলিফোন তার চাই। দেবাঞ্জনের আর্থিক অসুবিধার কথা কখনোই বুঝতে চায়নি রিণি। ওর চাই,

চাই-ই। ওকে খুশি করার জন্য না জানিয়েই টেলিফোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল দেবাঞ্জন।

তারপর একবছর দু'বছর করে পাঁচটা বছর কেটেছে। বাপ্টিকে পেয়ে রিণি মাতৃত্বের মমতায় অনেক কিছু ভুলেছে। ওদের সম্পর্ক এখন আর পাঁচজন দম্পতির মতই। প্রায় বত্রিশ ছঁই ছঁই রিণি কিন্তু তখনও টেলিফোনের জন্য একটা চাপা অভাববোধ অন্তরে পুষে রেখেছিল। আজ তাকে এতবড় প্রাইজ দিতে পেরে রিণির সমস্ত শরীরে নতুন নতুন খুশির ঢেউয়ের আছড়ে পড়া দেখতে দেখতে ওর সমস্ত না পাওয়ার যন্ত্রণা মুছে গেল।

সকালে সন্ধ্যায় ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোন বাজে। বেশির ভাগই রিণির। কাছের দূরের আত্মীয় বন্ধুদের সাথে টেলিফোনে অনর্গল স্রোতের মতন কথা বলে রিণি। বেতসলতার মতন হেলে দুলে রিণির এই টেলিফোন আড্ডা কতকটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল দেবাঞ্জনের। রিণির জন্য অনেক ছেড়েছে দেবাঞ্জন। সপ্তাহান্তে মায়ের কাছে যাওয়া ছেড়েছে। গ্রামের বাড়ির স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ, তেঁতুলতলা বটতলার হাওয়া স্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে তার সমস্ত শরীরে স্পর্শ রেখে যায়। বাপ্টির চোখের তারা শৈশব ভেসে ওঠে।

আজ অফিসে পেঁাছেই খারাপ খবরটা পেল দেবাঞ্জন। একটা চাপা গুঞ্জন অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। আজ কাগজে কলমে খবর এল। টেলিফোন বিলের দরুণ কোম্পানী থেকে পয়সা দেওয়া বন্ধ। দেবাঞ্জনের মন পাথরের মতন ভারী হয়ে গেল। কি বলবে রিণিকে? অবুঝ রিণি কি করবে একথা শুনলে। দেবাঞ্জনের অদৃশ্য ভাবনা ভীষণ অস্বস্তির মতন তার শরীর মনে জড়িয়ে রইল। টেলিফোন বিলের পয়সা মাইনে থেকে দেওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভব! কিছুতেই কূল কিনারা পায় না দেবাঞ্জন। শেষ পর্যন্ত কানেকশন কেটেই যাবে ক'মাস বাদে। তখন! এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল দেবাঞ্জন। শেষ চৈত্রের বিকেল তখন সবে শুরু হয়েছে। ফাঁকা মাঠে করাপাতা উড়ছে হাওয়ার সাথে। ব্যালকনিতে দাঁড়ানো রিণিকে দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। আশঙ্কা, উদ্বেগের মেঘ ঘন হয়ে উড়ছে মনের মধ্যে।

রিণি দেবাঞ্জনকে চা করে দিয়ে সামনে বসল। একটু অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাকে। দেবাঞ্জন ভাবছিল কি করে কথাটা বলা যায়। আড়চোখে রিণিকে দেখে খবরের কাগজের আড়াল তুলে দিল সামনে। এমন সময় রিণি

সেন্টার টেবিলের কাচে তর্জনী দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল—তোমাকে একটা কথা বলব ?

দেবাঞ্জন চোখ না সরিয়েই বলল—বল। রিণি বলল—টেলিফোন সারেন্ডার করে দাও। দেবাঞ্জন চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। হাতের কাগজ মাটিতে পড়ে ফ্যানের হাওয়ায় এলোমেলো হতে থাকল খস্ খস্ করে শব্দ তুলে। রিণির চোখ সেন্টার টেবিলের কাচে।

—অনেকদিন ধরেই তোমায় বলব ভাবছি। বিয়ের আগে অরিন্দম নামে একজনের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। রিণির যেন উচ্চারণ করতে যন্ত্রণা হচ্ছিল।

—বিশ্বাস কর, তাকে আমি এতগুলো বছর মনে রাখিনি। আজ মাস দু'য়েক হল বিদেশ থেকে ফিরে কি করে আমার ফোন নাম্বার পেয়েছে। জানিনা কে দিয়েছে। প্রায় রোজ দুপুরের দিকে ফোন করে আমায় বিরক্ত করছে। আমি এত টেনশনে থাকি। বারণ করলেও শোনে না। রিসিভার রেখে দিলে আবার রিং করে। আমার ভালো লাগে না এসব। বাস্টি আছে। রিণির গলায় কান্না আটকে যাচ্ছে। দেবাঞ্জনের কথা নেই। বুক ছুটন্ত ট্রেনের আলো-জ্বলা কামরাগুলো একে একে অন্ধকার মাঠ ঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। শালিকের ঠোঁটের মতন একটা হলুদ বিকেল তখন তাদের বারান্দার পাতাবাহারে খেলতে এসেছে। □

● ভ্রমণ

উত্তরাখণ্ড দেখে এলাম

সাগর বিশ্বাস

ছাত্রনেতারা আগে থেকেই বলে আসছিলেন এই সময়ে ভ্রমণার্থীদের উত্তরাখণ্ডে আসার প্রয়োজন নেই। কারন উত্তরাখণ্ড সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে পৃথক রাজ্য গঠন ও সংরক্ষণ বিরোধী গণ আন্দোলন কোন পর্যায়ে পে'ছাবে কেউ বলতে পারেনা। ১লা সেপ্টেম্বর নৈনিতাল জেলার খাতিমায় আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন মহকুমা শাসকও মারা গেছেন। প্রতিবাদে মুসুরীতে পরদিন ২রা সেপ্টেম্বর মিছিল বেরোলে সেখানেও রক্তাক্ত সংঘর্ষ এড়ানো যায়নি। সাতজন আন্দোলনকারী নিহত ও ২৬ জন আহত। পুলিশের ডি. এস. পি উমাকান্ত ত্রিপাঠি মারমুখী জনতার হাতে খুন। আন্দোলনকারীদের মধ্যে শ্রীমতী হংসে, শ্রীমতী বালামতী, রাইসিং বাগারি, বলবীর সিং নেগিরা ঘটনাস্থলেই শেষ। খাতিমা ও মুসুরীর ঘটনা গাড়োয়াল ও কুমায়ুন রেঞ্জের পুরো পার্বত্য জেলা-গুলিতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আটটি পার্বত্য জেলাই বিক্ষোভে উত্তাল। ৭ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকের চরম ব্যর্থতার পাশাপাশি ৮ ও ৯ তারিখে সমগ্র উত্তরাখণ্ডে বনধ ও চাকা জ্যামের ডাক। মুলায়ম সরকারের উপর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন প্রত্যাহারের পাশাপাশি দিল্লীতে কংগ্রেসের সদর দফতরে গাড়োয়ালের কংগ্রেসী-দের বিক্ষোভ। তাদেরও দাবী অবিলম্বে কংগ্রেস মুলায়ম সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করুক। উত্তরাখণ্ড আন্দোলন সঞ্চালন সমিতি সংসদের চলতি অধিবেশনেই দেশের ২৭তম রাজ্য হিসাবে উত্তরাখণ্ডের নাম ঘোষণার দাবী জানিয়েছে। উত্তপ্ত এই অবস্থার মধ্যে ২রা অক্টোবর মুজফ্ফর নগরে পুলিশের গুলিচালনা আগুনে ঘি ঢেলে দিল। বিভৎস এই সংঘর্ষে পঞ্চাশেরও বেশি মানুষ নিহত, আহতের সংখ্যা সহস্রাধিক, নিখোঁজের কোন ইয়ত্তা রইলো না।

সি বি আই. এর প্রাথমিক রিপোর্টে বলছে নিহতের সংখ্যা ২০ এবং ধর্ষিত ও লাঞ্ছিত নারীর সংখ্যাই ২৪। ফলশ্রুতি পার্বত্য জেলাগুলির সর্বত্র ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার ক্রমপ্রসার। গুলি। কার্ফু। ১৪৪ ধারা। অক্টোবর-নভেম্বরে যে অসংখ্য ভ্রমণার্থী পরিবার পরিজন সহ হরিদ্বার, ঋষিকেশ, দেরাদুন, মুসুরী, আলমোড়া, রানীক্ষেত, নৈনিতাল, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এবং কেদার বদরী দেখতে আসেন তাদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আন্দোলনকারীরা চাননা অকারণ ঝুঁকি নিয়ে ভ্রমণার্থীরা আসেন।

এরকম একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যেইনভেম্বরের '৯৪ মাঝামাঝি দেরাদুনে পৌঁছলাম। এসেছি দিল্লী থেকে হরিদ্বার ঋষিকেশ হয়ে। দেরাদুনে পা দিতেই পরিস্থিতির উত্তাপ বুঝতে দেরী হলো না। আমি যে ট্রেকারের যাত্রী, শহরের হৃদপিন্ডের উপরেই সে একটি প্রাইভেট কারকে ধাক্কা মারলো। ক্ষয় ক্ষতি কারোরই বিশেষ হলো না। কিন্তু ট্রেকারের যুবা চালক ছোড়নেওয়ালা পাত্র নয়। সে লম্ফ দিয়ে প্রাইভেট গাড়ীর বৃদ্ধ ভদ্রলোককে টেনে নামিয়ে আনলো রাস্তায়। আমরা যাত্রীরা ঠায় বসে থাকতে বাধ্য হলাম। বলা বাহুল্য, দেখতেও বাধ্য হলাম স্রেফ কব্জি আর গলাবাজির জোরে ছোকরাটি বৃদ্ধের পকেট থেকে কয়েকশো টাকা খসিয়ে নিলো। পরিবেশ মানুষকে এভাবেই সুযোগ সন্ধানী করে, এভাবেই দুর্বল করে দেয়।

রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট অধিকাংশেই বন্ধ। সরকারী বেসরকারী অফিসগুলোও প্রায় জনশূন্য। কোন বন্ধের কর্মসূচী ছিলো না। একটি মিছিল বেরোনোর কথা। তাতেই শহরের এই হাল। যেন অঘোষিত বন্ধ। তবে যানবাহন চলছে। ব্যাপারটা পরিস্কার হলো পরদিন। সকালের কাগজেই হেডিং : Traders take out an impressive rally. ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'দুন উদ্যোগ ব্যাপার মন্ডল' এর আহ্বানে শত শত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও দোকান-দারেরা পৃথক রাজ্যের দাবীতে মিছিল করেছে এবং কার্যত শহরকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। সংবাদপত্র জানিয়েছে এই মিছিল ও আন্দোলনের পেছনে উত্তরাখন্ড সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি, উত্তরাখন্ড ছাত্র সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি, উত্তরা-খন্ড পূর্ব সৈনিক সংঘর্ষ সমিতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মহিলা সংগঠন, সরকারী কর্মচারী শিক্ষক আইনবিদ সমাজ ও সংস্কৃতি কর্মীদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা কলকাতায় অনেক মিছিল মহামিছিল দেখেছি। কিন্তু কখনোই দেখিনি বৌবাজারের স্বর্ণব্যবসায়ী কিংবা বড়বাজারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ

একটি রাজনৈতিক দাবীতে একজোট হয়ে শহর অচল করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কাজেই ব্যাপারটা বেশ অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হলো।

খবরের কাগজ থেকে চোখ নামিয়ে সকালের চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একসময় দেরাদুন বনাঞ্চলের জন্য সুখ্যাত ছিল। নগর সভ্যতার সম্প্রসারণবাদী আক্রমণে সে খ্যাতিতে এখন অনেক ফাটল। যে সহস্রধারা দেখার জন্য মানুষ পাগলের মতো ছুটে আসে সে এখন 'নামেই তালপুকুর, আসলে ঘটি ডোবেনা'। সেখানে আজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আড়াল করছে হরেকরকম মনোহারী দ্রব্য-সম্ভার। আর ভ্রমণার্থী মানুজনও সেই বেলোয়ারী জিনিষের চারপাশে ঘুরঘুর করে সময় ব্যয় করে। প্রকৃতি নির্বাসিত হয় জীবনের গণ্ডী থেকে। দেরাদুনের আশেপাশে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের তালিকায় ডাকাতের গুহা বা রবারস কেভ, তপকেশ্বর মন্দির, লক্ষ্মন সিধ, মালসি ডিয়ার পার্ক এবং ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নাম আছে।

মুসুরী এখান থেকে ৩৫ কিলোমিটার। ট্যাক্সিতে সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা। বাসে আরো বেশী। কারণ পাহাড়ী রাস্তায় গতিবেগ তোলা যায় না। দূর থেকেই ছবির মতো সুন্দর মুসুরী পথিককে আকর্ষন করে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর সিংহদুয়ার এই শহরের চারপাশে স্প্রিং রোড, ক্যামেলস্ ব্যাক রোড, তেহরি বাজার রোড, সিন্টার বাজার রোডের মতো রাস্তাগুলিতে শুধু হেটে বেড়িয়েও সুখ। বিশেষত বেড়ানোর মরশুম মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবরে। ম্যাল থেকে হাটতে হাটতে পথের পাশে গাড়োয়ালি নারী পুরুষের সাজানো দোকান পশরা দেখলে অবশ্যই দাঁড়াতে ইচ্ছে করবে। নানান রকম হস্তশিল্প, চারু ও কারুশিল্পের কাজ সত্যিই দেখার মতো। আর কত যে হোটেল রেসর্ট আছে এই শহরে তার যেন গোনা গুনতি নেই। সরকারী পর্যটন বিভাগের পুস্তিকাতেই ১৩৭টি হোটেল, ৮টি ধর্মশালা ও তিনটি সরকারী বাংলোর নাম ঠিকানা দেখা যাচ্ছে। ৬৪·২৫ স্কোয়ারকিমিটার একটি শহরের মধ্যে, যেখানে লোকসংখ্যা মাত্র ২৫,৪০০, এটা ভাবা যায়? এতেই বোঝা যায় গাড়োয়াল উপত্যকার এই নয়নসুখে শহরে কি পরিমাণ ভ্রমণার্থী সমাগম হয়। অভিনন্দন জানাতে হয় ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সেই দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন ইয়ংকে, যাঁর নিরলস চেষ্টায় ১৮২৭ সালে এই শহরের পত্তন হয়েছিল। মাত্র ৬ কিলোমিটার গেলে আর এক অভিযাত্রী ইংরেজ অফিসারের বাড়ী দেখা যায়,—জর্জ এভারেস্ট,

যাঁর নামে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নামকরণ হয়ে আছে। ১৫ কিলোমিটার গেলে বিখ্যাত কেম্পটি ফলস্। সাড়ে চার হাজার ফিট ওপরে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম কুলাঘরের দিকে। সেই কুলাঘর যেখানে আড়াই মাস আগে উত্তরাখণ্ড আন্দোলন কারীদের উপর উত্তরপ্রদেশ পুলিশ গুলি চালিয়েছিলো। যেখান থেকে পুলিশের ডি. এস. পি উমাকান্ত ত্রিপাঠিও প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেননি। এখান থেকে রোপওয়ে করে গানহিলের ওপরে যাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে এখান থেকে গান ফায়ারের মাধ্যমে দ্বি-প্রহর ঘোষিত হতো। সেই শব্দ শুনেই মানুষেরা ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিতো। গানহিল নামটা এই কারনেই। কুলাঘর বা রোপওয়ে টার্মিনাসের পাশেই উত্তরাখণ্ড সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতির বিধ্বস্ত কার্যালয় দেখলাম। জানলা দরজা দেয়ালের গায়ে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। ২ সেপ্টেম্বরের সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর অফিস স্থানান্তরিত হলেও আন্দোলনকারীরা সামনের রাস্তার উপরে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। এখানেই পরিচয় হলো উত্তরাখণ্ড ক্রান্তি দলের কানোয়ার সিং রাওয়াত, বি জে পির সতীশ কালা, সি. পি. আই-এর বীরেন্দ্র সিং প্রমুখের সঙ্গে। সত্তরোর্ধ এক বৃদ্ধাও এদের সাথে অবস্থানরতা। উত্তর কাশীর বনগাঁও গ্রামসভার প্রধান কানোয়ার সিংকে ২ তারিখেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ছাড়া পেয়েছেন ৮ সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো একটি স্মারকলিপির জেরক্স কপি দিলেন কানোয়ার। ওঁরা জানালেন, কুমায়ুন রেঞ্জের নৈনিতাল, পিথোরাগড়, আলমোড়া এবং গাড়োয়াল রেঞ্জের চামোলী, পৌড়ি, দেরাদুন, তেহরি, উত্তর কাশী এই আটটি জেলার ৫৮ লক্ষ মানুষের এই মুহূর্তে একটাই দাবী—উত্তরাখণ্ডকে আলাদা রাজ্যের স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রস্তাবিত এই রাজ্য সীমার মধ্যে আপাতত ৮টি জেলার নাম করা হলেও ভবিষ্যতে হরিদ্বার জেলাকেও সংযুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, হরিদ্বার তো পার্বত্য এলাকার মধ্যে পড়েনা—তাহলে অন্তর্ভুক্তির কথা আসছে কেন? ওঁরা বললেন, আক্ষরিক অর্থে পার্বত্য গাড়োয়াল কুমায়ুনের বাইরে থাকলেও হরিদ্বারের জনগণের জীবনযাত্রা ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে পাহাড়েরই মিল বেশী। আর এই জেলায় আন্দোলনও যথেষ্ট প্রবল। মাসখানেক আগে তো বাইরের লোকেরা হরিদ্বারে ঢুকতেই সাহস পায়নি। এইত ঋষিকেশে ১৪৪ ধারার মেয়াদ আবার বেড়ে গেল।

জানতে চাইলাম, প্রস্তাব এই জেলাগুলি নিয়ে আলাদা রাজ্য হলে কী

সুবিধে হবে ? সি. পি. আই এর বীরেন্দ্র সিং বললেন, মানুষের ভাল হবে, এলাকার উন্নতি হবে। আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্য। রাজধানী লক্ষ্ণৌ এখান থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে। রাজ্যের প্রশাসনিক সদরদপ্তর, উচ্চ আদালত সবই সেখানে। অতএব মানুষের প্রাত্যহিক অসুবিধা-গুলি সহজেই অনুমেয়।

—কিন্তু আলাদা রাজ্য চালানোর মতো কি সম্পদ আছে আপনাদের ?

—কি নেই বলুন। কাঠ এবং ফলসহ বিশাল বনজ সম্পদ, পশম, প্রাণী-সম্পদ, চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের অজস্র নিজস্ব জড়িবুটি, জলবিদ্যুৎ সবই আছে। এই মুহূর্তে ২০,০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

—রাজনৈতিক দলগুলি আপনাদের যুক্তি সমর্থন করছে ?

—সমাজবাদী এবং বহুজন সমাজবাদী পার্টি ছাড়া সবাই আমাদের সমর্থন করছে। এমনকি কংগ্রেসও।

—সি. পি. আই (এম) ?

—সি. পি. এম. আমাদের আন্দোলনের নৈতিক সমর্থক। কিন্তু সরাসরি সংঘর্ষ সমিতির মধ্যে থাকতে রাজি নয়।

—কেন ?

—কারণ সি. পি. এম ঠিক আলাদা রাজ্য গঠনের পক্ষে নয়। তারা স্বায়ত্বশাসনের কথা বলেন। যেমনটি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে গোর্খাদের জন্য।

—আপনারা রাজী হবেন ?

—না। তার জন্য এই আন্দোলনের প্রয়োজন ছিলনা। আজ তিনমাস হয়ে গেল পর্বতীয় কর্মচারী শিক্ষক সংগঠনের লাগাতার আন্দোলন চলছে। শিক্ষকেরা বেতন পাননা। স্কুল-কলেজ বন্ধ। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ এককাট্টা যতদিন না দাবী মিটছে ততদিন আন্দোলন চলবে। একটু থেমে বীরেন্দ্র সিং বললেন, তবে জ্যোতিবাবু একটু চেষ্টা করলে হয়ে যেতো।

—জ্যোতিবাবু ? মানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ?

—হ্যাঁ, জ্যোতিবাবুই একমাত্র মানুষ যার কথা মুলায়ম সিং-এর ফেলার ক্ষমতা নেই। মুলায়ম সিং বিরোধিতা না করলে এতদিন উত্তরাখণ্ড হয়ে যেতো।

—উত্তরাখণ্ড হওয়া না হওয়া কি তাহলে মুলায়ম সিং-এর উপর নির্ভর করছে ?

—ঠিক তা বলছিনা। মুলায়ম সরকার তো প্রকৃতপক্ষে উত্তরাখণ্ড মেনেই নিয়েছে। কিন্তু গোল বেঁধেছে সংরক্ষণ নিয়ে। তারা পাহাড়েও ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ প্রয়োগ করতে চায়। আমরা এটা মেনে নিতে পারিনা। এই কারণেই বলছিলাম যে একমাত্র জ্যোতিবাবুই পারতেন মুলায়মকে সংঘাতের রাস্তা থেকে সরিয়ে আনতে এবং কেন্দ্রকে পরামর্শ দিতে।

উত্তরাখণ্ড আন্দোলনকারীদের মুখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উপর একটা প্রচ্ছন্ন আস্থাশীলতার কথা শুধু মুসুরীতে নয়, অন্যত্রও শুনেছি। আপাত-দৃষ্টিতে এই আন্দোলন একবগ্গা মনে হলেও এর অন্তর্নিহিত জটিলতা বুঝতে গেলে একটু পেছনে তাকানো দরকার।

পঞ্চাশের দশকে জহরলাল নেহেরু দেশের রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য কে. এম. পানিক্কর উত্তর প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নে রাজ্যটিকে দ্বি-খণ্ডিত করার পরামর্শ দেন। ভারতের বৃহত্তম এই রাজ্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে হয়েছিল হিমালয় সন্নিহিত গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও ধ্যান ধারনা রাজ্যের বাকী অংশের থেকে একেবারেই আলাদা। নেহেরু সরকার এই পরামর্শে সেদিন কর্ণপাত করেননি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থ এটিকে ক্ষতিকর বলে বাতিল করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৭ সালে জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরন সিং আর এক কদম এগিয়ে গিয়ে রাজ্যটিকে ত্রিখণ্ডিত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্বল্পায়ু জনতা সরকার সে প্রস্তাব বাস্তবায়িত করে যেতে পারেনি। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এলে স্বাভাবিক কারনেই বিষয়টি পাদ প্রদীপের সামনে আসেনি। কিন্তু ইত্যবসরে স্থানীয় কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ভোট রাজনীতির অনিবার্য দাবী অনুযায়ী উত্তরাঞ্চল বা উত্তরাখণ্ডের আওয়াজ উত্তরোত্তর জোরদার করে তুলেছে। অতঃপর ১৯৯২ সালে বি জে পি ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ বিধান সভায় 'উত্তরাঞ্চল' নামে পৃথক রাজ্যের প্রস্তাব পাশ করিয়ে কেন্দ্রের অনুমোদন চেয়ে পাঠান। কিন্তু কল্যাণেরও বৃহস্পতি কল্যাণকর ছিলনা। অনেক জল প্রপাত ও প্রবাহের পর গদীয়ান হলেন মুলায়ম সিং যাদব। স্পষ্টতই 'উত্তরা খণ্ড' প্রশ্নকে পাশ কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সে চেষ্টাও মুলায়ম করেননি, কিন্তু মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর' জন্য ২৭

শতাংশ সংরক্ষণের নীতি সর্বত্র আরোপ করার সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাহাড়ের ওই আটটি জেলার 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যা মোট সংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ। অতএব সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালো ছাত্রসমাজ। ছাত্রদের প্রতিবাদ ক্রমশঃ রাজনৈতিক সংস্পর্শে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। এখন ছাত্র শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশই উত্তরাখণ্ড সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতির দাবী দাওয়ার সমর্থক। অবস্থার গভীরতা দেখে রাজ্য সরকার সমিতিকে সংরক্ষণ বিরোধী এবং বিজেপিকে প্রধান উস্কানিদাতা বলে চিহ্নিত করছে। অন্যদিকে আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ২ শতাংশ মানুষের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি 'চাপিয়ে' দেবার অপরাধে মুলায়ম সরকারকে অভিযুক্ত করছে বিজেপি। এই চাপান উতোর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ন যথৌ ন তস্থৌ অবস্থার সুযোগে আন্দোলন ক্রমশঃ রক্তাক্ত পথে এগিয়ে গেছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও এদেশের মাটি স্বাধিকারের দাবীতে রক্তাক্ত হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী সময়েও দেশে যথার্থ জাতীয় ঐক্যবোধ জন্মায়নি। ৩০-৪০-এর দশকে গড়ে ওঠা দেশাত্মবোধকে ধরে রেখে জাতীয় চরিত্র গঠনের দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল, তারা এতটাই ব্যর্থ যে জাতীয়তাবোধের স্থিতিশীলতাটুকুও তারা রক্ষা করতে পারেনি। উপরন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিচালনার দোষে একটা সদ্যস্বাধীন জাতিকে ক্রমশঃ দুর্নীতি, ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ ও চরিত্রহীনতার অতল গহ্বরে নামিয়ে দিয়েছে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের আসমান জমিন পার্থক্য দিনের পর দিন মানুষকে হতাশ ও স্বার্থপর করে তুলেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের বাণী বক্তৃত অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতে পরিনত হয়েছে।

পাশাপাশি, পৃথক রাজ্য গঠন বা স্বাধিকার আন্দোলন যে সব রাজ্যে চরিতার্থ হয়েছে সেখানেও আস্তে আস্তে নতুন এক শাসক ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। এককালের 'শোষিত' মানুষ সময়ের অল্প ব্যবধানে শাসক হয়ে বসেছে। সাধারণ মানুষ, জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে শাসকশ্রেণী পৃথক পরিসীমাতে যা, ক্ষুদ্র পরিসীমাতেও তাই। ফলশ্রুতি পৃথক রাজ্যেও যা, স্বায়ত্ব শাসনেও তাই। এই অবস্থায় রাজ্য ভেঙে দ্বিখণ্ড ত্রিখণ্ড করলেও রাষ্ট্র

ব্যবস্থার মূলে কাঠামো পরিবর্তিত হয়না। তবে হ্যাঁ, প্রশাসনিক সুবিধা এবং মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে দ্রুততা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হলে এধরনের বিভাজন তো হতেই পারে। সে ক্ষেত্রে 'লড়কে লেঙ্গে'র প্রশ্ন ওঠে না। 'নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী' মনোভাবও অবান্তর।

উত্তরাখণ্ডের আন্দোলন যে স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে বিবদমান সকল পক্ষকেই খোলামনে দেশ ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রশ্ন মাথায় রেখে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। অহেতুক জেদাজেদি পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে তুলতে পারে। □

Space donated by

A Well Wisher

● কবিতা

[টোমাস ট্রান্সট্রোমার (৬৫) সুইডেনের খ্যাতনামা কবি। এ পর্যন্ত লিখেছেন মাত্র ১১টি বই। পৃষ্ঠার হিসেবে সাকুল্যে দুশোর মত হবে। পৃথিবীর সাহিত্যে কম লিখেও যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, টোমাস তাঁদের দলের মানুষ। এ পর্যন্ত তেতাল্লিশটি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বাঙলা ভাষায় অনূদিত প্রথম বইয়ের নাম 'জীবিত ও মৃত' (অনুবাদ : গজেন্দ্র কুমার ঘোষ)। দ্বিতীয় 'বিষণ্ণ গণ্ডোলা' যন্ত্রস্থ, আগামী বইমেলায় প্রকাশিত হবে। গজেন্দ্রকুমার ঘোষ অনূদিত নির্মীয়মান সেই কাব্যের অন্তর্গত তিনটি কবিতা আমরা অগ্রিম প্রকাশ করলাম —সম্পাদক]

জুলাই—৯০ থেকে

[Fran Juli]

তা ছিল অত্যোষ্টি অনুষ্ঠান
আর আমি অনুভব করছিলাম, মৃত মানুষটি
আমার চিন্তাগুলো পড়ছিল
আমার নিজের চেয়েও ভাল করে

অগ্ন্যাগার নিঃসাড় ছিল, পাখিরা কূজনরত ছিল।
বাইরের ঝাঁঝালো রোদে উন্মুক্ত বিবর।
আমার বন্ধুর স্বর তার অংশীভূত
মিনিটের প্রত্যন্ত সীমায়।

বাড়ির রাস্তার দিকে স্টিয়ারিং মেলে ধরি আমি
বৈশাখী দিনের বর্ষণের
দ্যুতি আর স্তব্ধতার অন্তর্গূঢ় দৃষ্টির শামিল
চন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টির শামিল।

সূর্যবলয়িত দৃশ্য ।

Landskap med Solar]

বাড়ি ঘিরে উৎসারিত হয় সূর্য
নিজেকে স্থাপিত করে পথের মাঝখানে
আর আমাদের ওপর প্রশ্বাস নেয়
তার রক্তাভ ঝাপটায় ।
ইনসব্রুক অবশ্য তোমাকে আমি ছেড়ে যাব ।
কিন্তু আগামী কাল
থেকে যাবে গনগনে সূর্য এক
এ অধর্মত ধ্বংসর বনানীভিতরে
যেখানে আমরা কাজ করবো এবং বাঁচবো ঠিকই ।

কোকিল

[Goken]

একটি কোকিল কুহু কুহু ডাকছিল বীচগাছে বাড়ির উত্তরে। এতোই শব্দিত ছিল. যে প্রথম আমি ভেবেছিলাম কোন এক অপেরাগায়িকা বুঝি বা কোকিলের অনুকরণ করছে। অবাক হয়ে আমি পাখিটিকে দেখেছিলাম! তার লেজ উপর নীচ ওঠা নামা করছিল সুর-সঙ্গতি রেখে তালে তালে একটি পাম্পের হাতলের মত। পাখিটি দুঠ্যাঙে লাফাচ্ছিল, একেবারে ঘুরে ঘুরে এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে আবহযন্ত্রের চিহ্নাকে। তারপর উঠে এসে কিচিরমিচির করে উড়ে যায় বাড়ির ওপর দিয়ে বহু দূরে পশ্চিমের দিকে···গ্রীষ্মকালের বয়োবৃদ্ধি হয় এবং সব কিছুই একযোগে প্রবাহিত হয় এক বিষণ্ণ নিনাদে। কুকুলুস কানুরুস ফিরে যাবে উষ্ণ মন্ডলে। সুইডেনে তার অন্ত্যকাল। এখানে তার সময় ছিলনা দীর্ঘায়িত। আসলে এই কোকিল জায়িরের নাগরিক···আমি আর মোটেই ভ্রমণে উৎসুক নই। কিন্তু ভ্রমণ আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। এখন যখন আমি ক্রমান্বয়ে কোনঠাসা হচ্ছি, যখন বার্ষিক বয়োবৃদ্ধির বলয়গুলো বাড়তির পথে, যখন পড়ে উঠবার জন্য চশমার প্রয়োজন। সব সময়েই অনেক কিছু ঘটছে যা আমাদের সহ্যাতীত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এসব ভাবনাগুলো আমাকে এখন বহন করে যেমন সুসি ও চুমা অনুগত বয়ে যায় লিভিংস্টোনের স্মৃতি সামগ্রিক আফ্রিকার অভ্যন্তরে।

কৃষকের গল্প । মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তুমি তো সবুজ নও অথচ পান্নাই হয়ে আছো
বরং কিছুটা গলানো তরল সোনা লেগে আছে
মুখের কোমলে
পঞ্চাশ পেরুনো মাঠে আজো তবু
এত সবুজ ফসল এত গান
কবি এক বিমুগ্ধ কৃষক···
প্রতিমার ভিতরে রয়েছে খড় হয়তো সোনালি
তোমার ভিতরে
হৃদয় হৃদয় হয়ে জেগে আছে
বাইরের চোখ আর কতটুকু দেখে নিতে জানে
শিকড় কোথায় আছে গাছ জানে আমি তো জানি না
তুমি তো সবুজ নও অথচ পান্নাই হয়ে আছো
আর আমি চিরকাল বিমুগ্ধ কৃষক···

জয়পুর কিস্সা । যশোধরা রায় চৌধুরী

দারুক, শীতল, আহা, একটুখানি ঠাণ্ডা দারু দাও
ছায়ায় বিহারমাত্রে আসন গ্রহণ করি, মনে হয়, ভুলেও পারব না

স্বদেশ বর্জন করা, আর মিত্র ভাই ভাই জনে
ত্যাগ দিয়ে মহামাত্যদের সঙ্গে পারব না ভোজনশৈলী করা

মারুবেহাগের মত সিলিকা সৈন্ধব গান টেনে
লম্বা হয় বাঁশিমুখ খোলমুখ করতালমুখিনী

বালক-বালিকা যারা : দেশজ, গ্রামজ
কি ভীষণ ভালোবাসি তীব্ররঙা লহঙ্গা ও চোলি
সমস্ত শরীরে আয়না-বসানো. ঝিকোচ্ছে একটি
রোদ ঝাঁ ঝাঁ মরুর দুপুর

সুস্বাদু হরিণীমাংস, ভালোবাসছি, আমি এই টেরেসকাফেতে
যা খেলাম, ও এখনিক দারুক, অমাত্য, প্রিয়,
দাম একটু বেশি নিচ্ছো, ভাই

চারটি কবিতা । অমিতেশ মাইতি

ভোরবেলা

অন্ধকারে চমকে উঠল মাঝরাতের নিদ্রা
মস্তিষ্কের কোষে ঘি ও বিদ্যুতে মসৃণ চলে গেল
কার যেন হাত, ঈষৎ ধাতব
উড়ন্ত চাকি ঢুকে গেল বুকে
রাতের ট্রেন হারাপথ পথিকের মতো উদভ্রান্ত
শুধু এক ফোঁটা রক্ত
প্রবল ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে পড়ল ভোরবেলার দিকে

রতিমগ্নতার সময়

নিজেকে প্রোথিত রাখি তোমার শরীরে
দেহ গড়ে তোলে নদী
নতুন কদর পত্তন করে
দুটি হাত—
আদি ও অনাদি

ছাপাখানার ভূত

সব তোলপাড় করে চলে যেতে চেয়েছিল বলে
গত চৈত্রে পাতা ঝরেছিলো, উঠেছিল কার মরণে
হে ব্যর্থ কবি তুমি ছাপাখানার ভূত হও
আঁধার কথা বলুক, ভেঙে যাক শিলা
ক্যাম্প ফায়ার

এবার উঠতে হবে, এখানে রুক্ষতা মূল ধরে টানে
তপ্ত হাওয়া এসে তছনছ করে বারমাস্যা
এবার জাগব, উঠতে হবে পায়ে পায়ে
শিকড় গিয়েছে একা বড় বেশি দূরের গভীরে
নিজেকে মোচন করে শাপমুক্ত হব
মরুভূমি খুঁড়ে কে আর পেয়েছে কবে জল
এবার তুলতে হবে তাঁবু ও শিকড়

দাসত্বের গান। পার্থ বসু

কাঁধের কালশিটে উত্তরাধিকার
করেছি
বহুদিন
ক্রুশবহন

পায়ের শৃঙ্খলে পৌরাণিক কাল
প্রণীত
পিছুটান
দুঃসাহস

হয় নি সুতরাং, চাইব স্বাধিকার
কি করে জানি
স্পার্টাকাস
শহীদ

ভুলি নি মহারাজ বিনীত শিক্ষায়
আসলে
আমাদের
দাস্যে হিত

কবিরা গান গায়, গাইতে হয় তাই
শুনতে
হয় নাকি,
সোনেটা কে ?

কাঁধের কালশিটে উত্তরাধিকার
একথা
মনে রাখি,
মনে থাকে।

কালো ও কুচ্ছিত বলে । রুক্ষাবসু

কালো মেয়ে আমি, তাই বলে ভালোবাসা, প্রেমে পড়া,
কারো জন্যে হু-হু করে পুড়ে যায় বুকের ভিতরে,
এইসব পাপ নাকি, ভুল, নষ্ট, ছেলেখেলা নাকি আমার জীবনে ?
কালো ও কুচ্ছিত আমি কিন্তু প্রাণভরা ভালোবাসা
ভালো বাসবার জন্য অদ্ভুত আবেগ একেবারে
বসন্ত কুসুমের মতো থরো থরো ফুটে ওঠে প্রাণের বাগানে ।
ফর্সা ও সুন্দর মেয়েদের জন্য কত খেলনা সাজানো রয়েছে !
সুন্দর কিশোর আছে, মায়াবী যুবক, স্নিগ্ধ প্রৌঢ়
সকলেই শুধু ভালোবাসে ফর্সা ও সুন্দর মেয়েদের !

আমাকে পোঁছে না কেউ ।
আমি একা একা রাত জাগি,
অদ্ভুত চাঁদের রাত জাগি ।
রুক্ষা নবমীর চাঁদ ঘোর রাতে উঠে আসে মাথার ওপর
উঠে এসে চমৎকার হাসে, বলে, 'খুকী, তোর পুরুষ কোথায় ?'
পুরুষ কোথাও নেই, পুরুষেরা কেউ নেই,
রূপমুগ্ধের দল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ।

আমার আঙিনা ফাঁকা, কোনো খানে কেউ নেই আজো ।

মনে করো । শিখা ঘটক

মনে করো কোনো ক্ষয় ক্ষতি নেই,
এ সকালে উপচে উঠেছে
বিশুদ্ধ রৌদ্রের সাদা ফেনা ।
হাতে ধরা
পেয়ালার উষ্ণ পানীয়ে,
নিশ্চিন্তে খেলা করে
আমাদের সনাতন প্রেম ।

সংবাদপত্রের থেকে,
খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে
বীভৎস অক্ষরগুলো—
পড়িয়ে দিয়েছে কেউ।

জেদাক্ত শবদেহ যত,
উঠে হেঁটে চলে গেছে
স্বদেশের, পৃথিবীর সীমানার দূরে দূরে পারে।

কোথাও বেদনা নেই।
আমাদের স্নায়ুর উপর
অবিরাম প্রহারের,
চাবুকের শব্দ নেই কোনো।

মনে করো একদিন—
সহজ জীবন কাটালাম।

কোথাও লুকোনো ছুরি নেই।
আঙিনার বিষবৃক্ষে লম্পট পাখীর শিষ,
পণ্য নারীকে নিয়ে বেশভূষা পরাতে গিয়েছে
এখন সে প্রকৃত প্রেমিক।

মনে করো আজ এই
অকলুষ গোধূলির থির থির প্রহর বেলায়,
জটিল কুটিল কোনো যুগচিহ্ন উঠছে না ফুটে!

মনে করো রাত্রি এসেছে।
হলুদ নদীর তীরে পান্থশালায়,
মনে করো রাত্রি এসেছে।
উপোষী যুবতী ভাসে চাঁদের তরল সাম্পানে।
মনে করো রাত্রি এসেছে॥

একুশ শতাব্দী ৫০

মণিবেলির মেয়েটিকে । সব্যসাচী সরকার

তুমি কি পারো না হিংসা এনে দিতে ?
পারো না ধানের শীষে আগুন জ্বালাতে
এখনো তোমার উর্বর জন্মভূমি যেমন জেগে থাকে
রাত্রি চিঠিতে
সমূহ শরীর ও আঘাত কীভাবে নিয়েছো বলো
তুমি কি পারো না হিংসা এনে দিতে ?
কীভাবে সুখী হবে বলো, সভ্যতা যে বহুদূরে
জন্মপ্রহরে শিয়রে যার আক্রান্ত মেঘ
সে কখনো অতীত নয়, কীভাবে জেগে থাকো
ক্লান্তিহীন প্রারব্ধ-প্রহর ?
অথবা, তুমি জানো কিছু নিষিদ্ধ যাপন-প্রক্রিয়া
যেমন তোমাকে দেখি এই নির্জন পাহাড়ি আলোতে
ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই বয়ে আনা নাগরিক হাড়গোড়

পারো না, আরো সবুজে-হিংসা এনে দিতে ?

ফিরে দেখা । তাপস রায়

কথা আছে খুব স্বেচ্ছা বৃষ্টিপাতে
জমানো অসুখ উড়ে যায় বহুদূরে
আজ যে জামায় রৌদ্রে লেগেছে দেখি
অনতিকালেই তার রঙ হ'লো ফিঁকে

কখনো হেঁটেছি শিপ্রার তীর ধরে
শিপ্রা কি নদী অথবা কেবলি মেয়ে
মনে হ'লো কেউ অভিমানে আছে চেয়ে
শ্রাবণ তাহার ডানার গন্ধ মাখে

গোপনে অনেক উৎসব এলো দেশে
অরূপ আগুন সেজেগুঁজে ঠিক দাঁড়ালো
আমিও কাঙাল প্রতিপায়ে হেঁটে মন্থরে
ঘুরে ফিরে যাই স্মৃতি কলকাতা বন্দরে

স্বাধীনতা । গৌতম ভট্টাচার্য

ঐ তার নিঃস্ব ও ভূতগ্রস্ত পাথর প্রতিমা,
ওকে ঘিরে
ফাটা জমি, পত্রহীন গাছ
আর সীমান্তের কাঁটাতার বেড়া,
ওর কথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়
বিরুদ্ধ হাওয়ায় ; বাঁধ ভাঙা উদ্দাম উচ্ছ্বাস
দিগন্তের গা'য়—
ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে হাহাকার হায় ;
রুদ্ধ অশ্রু শুষে নেয় উলঙ্গ পৃথিবী,
পক্ষ ও বিপক্ষের লোক
কারা ছিল আজ মনে নেই—
সন্দেহের চোখ ওকে ফেলে
চলে গেছে অন্য কোন গুরুতর কাজে,
ওকে ঢেকে বেড়ে উঠছে—
তারাদের মতো নির্জনতা,
সম্পর্কের বাধা নেই, মোহ জাল,
আবেগের পিছুটান রয়ে গেছে—
বিস্মৃত স্বদেশে ; নির্বাসিত
স্বাধীনতা আপাততঃ
সন্নিহিত অপৌরুষে জব্দ হয়ে আছে ।

পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে লেখা একটি কবিতা । সুমিতেশ সরকার

ডেনকালির জঙ্গল,
তোমার গভীরে প্রবেশের অনুমতি চাইব না আজ

শুধু, অন্ধকার পিঁপড়েরা
আমার মস্তিষ্কের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুক !

ভাবনার বলয় । সমর্পণ মুখোপাধ্যায়

শেষ দুপুরে তুমি চিত্রার্পিত
কথা দাও পাবে না শোভা
বিষণ্ণ বিকেলে ;
এই সব ভাবনার বলয়ে
নিষ্ঠুর সত্য যদি কিছু থাকে
সময় থেকে সময় হতে
দাঁড়িয়ে আছে একটি নক্ষত্র :
গোলাকার পৃথিবী— স্থির
আপন চক্রবালে—।
কোন ছবি স্থির নহে
বাহিরে হেঁটে যায় মানুষ
কথা বলে—চেয়ে দ্যাখে
সময়ের গতি প্রকৃতি ।
সমস্ত ঋতু ঘুরে ফিরে জানায়
একই কথা—
নতুন শব্দ সংযোজনও আর হয় না,
বিষণ্ণতা ঢেকে দেয় আরও
কিছু প্রিয় পরিচয় : মানুষ ।

প্রেমরস । নারায়ণ বিশ্বাস

কিছুই থাকে না প'ড়ে
ফল, অর্থ, নারীর শরীর ।
প্রেম শুধু থাকে ।

রক্তে 'কোহল থাকে কয়েক প্রহর ।
যুদ্ধজয়, বিপ্লবের গান
তাপ কিংবা শীতের কাঁপন
সন্তানের কোমল হাতের ছোঁয়া
ভরপেট তামাকু সেবন ।

কিছুই থাকেনা প'ড়ে
আড়ি কিংবা ভাব।
যৌবনের কলরব, বল
একদিন সুচারু পাহাড়
জলের অতলে যাবে।
দীর্ঘ গাছ অহংকারী হ'লে
বজ্রপাতে মরে···

কিছুই থাকে না প'ড়ে
প্রেমরস থাকে শুধু॥

শবনম জেগে আছে। মৃণাল দত্ত

মধ্য পঞ্চাশে কখনো কখনো
মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে,
ছড়া কাটে নৃত্য বিভঙ্গে।
বলে উঠি, দাঁড়া,—
দ্যাখ্, শবনম রয়েছে আমার শিয়রে।

শবনম পাশে এলে
জোনাকি অন্ধকারে
সূর্য লুটোপুটি খায়
অঘ্রাণী প্রান্তরে ;
মধ্য পঞ্চাশে
দুরন্ত একুশ জ্বলে ওঠে,
লাথি মারে শতাব্দীর প্রাচীন তালায়।

শবনম পাশে এলে
সন্ত্রস্ত মৃত্যু
শুয়ে পড়ে নিজস্ব কবরে।

পথের শিল্প । দিলীপকুমার মহাজী

দীর্ঘ রেলপথ চলেছি আমি একা একা
পিছনে আসছি ফেলে নিজস্ব পাহাড়
অদূরে সবুজ রেখা দিগন্তে বিলীন
ট্রেনের গতির সাথে হৃদয় কম্পন

জানালার পাশে বসে মুখোমুখি তারা
কপালে উদ্বিগ্ন আঁকা দিঘি ভরা জল
ছল ছল ঢেউ উঠে আমি ডুবে যাই
দুইটি সাগর নীলে মুক্তা প্রবাল

আমি মাটি খুঁড়ি ভাঙি নিজস্ব দৃষ্টিতে
কখনো লাজুক মুখ কখনো অবাক
এভাবেই মুখোমুখি অসম্ভব কথা
একটি নদীর ঢেউ বার বার চাওয়া

পাশের যাত্রীর মুখ মনেই পড়েনা
জানিনা এতটা পথ কত কাছে ছিল
কি করে দিনের বেলা জ্যোৎস্না ঢুকে যায়
পেয়েছি গন্তব্য স্থলে তার পরিচয়

এই যাত্রা পথটুকু শিল্প হয়ে যায়
বিশুদ্ধ বাতাসখানি পালক উড়ায়
একটি পথের ঋণ অনন্ত আকাশ
পুনরায় যাত্রা হোক কটাক্ষ আঘাত ।

ভালোবাসা এক পবিত্র উচ্চারণ । সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

পবিত্র উচ্চারণ প্রিয়, কোন কাজে লাগে কার
তাই নিয়ে কতদূরে যেতে পারে অমল কিশোর
তাই নিয়ে কতদূরে যেতে পারে নরম কিশোরী
সজনের সাদা ফুলগুলি, দুরন্ত হাওয়ায় ওড়ে
সরল জীবন যাপন ছেড়ে, ছুটে যায় যৌবন
আকাঙ্খার ভিতরে ফুল ফোটেনা এখন
নদী জলে ভাসেনা সাদা পাল তুলে নৌকা
সবুজ ধানের ক্ষেত, বৃষ্টির মায়ায় ভেজেনা
পাখী মরে গেছে, বক,মাছরাঙ্গা, বুলবুল
সারি সারি ছাদ, কার্ণিস, অ্যান্টেনা
সারি সারি শব্দ, বিস্ময়, উচ্চারণ
ঘরের দেওয়াল ক্রমে ছোট হয়
ঘরের দেওয়াল আরও কমে আসে,
আলোর উৎসাহ নিভে যায়, স্বপ্নের অতীত
আমি ছিন্ন প্রাণ নিয়ে সকালের আলোয়
ঘাসের শিশির গায়ে মাখি,
বুঝি কোন দূরতম প্রান্তে, কোন পর্বতের
শিখর চূড়ায়, সমুদ্রের অতল গভীরে
আমার যে প্রিয়, প্রিয় যে বড়ই আমার
তার আসার আশ্বাস নিয়ে, বসে থাকি
আর ভাবি পবিত্র উচ্চারণ কার, কোন কাজে লাগে ।

এবার বই মেলায় প্রকাশিত হচ্ছে প্রভঞ্জন হালদারের
কবিতার বই

"শব্দে আছি নৈশব্দের মোহে"

● স্মরণের আবরণে

নীলিমা সেন

(১৯২৮—১৯৯৬)

পার্থ ঘোষ

তখন সবে আমি রেডিওতে চাকরীতে ঢুকেছি। ১৯৬৪ সালে ডিউটি রুমে বসে আছি। বেলা ১১টা। তুমি এসে দাঁড়ালে ডিউটি রুমের সামনে। তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন অমিয় দা। তোমার পরণে ছিল হাল্কা চাঁপা রঙের শাড়ী। সাদা ব্লাউজ। ঘাড়ের কাছে ভারী একটা আলগা খোঁপা। আর খোঁপায় একটা ছোট্ট সাদা ফুল। হ্যাঁ—তোমার রেকর্ডিং ছিল সেদিন। তোমাকে তার আগে মঞ্চে দেখেছি কয়েকবার। তাই চিনতে একটুও অসুবিধে হয়নি। তোমার হয়ত মনে নেই, আমি নিজে উঠে এসে তোমায় জানালাম—"আমি কিন্তু আপনার ভীষণ ভক্ত। আপনার গান আমার মনকে সত্যিই সব ভুলিয়ে দেয়—।" সেই তোমার সংগে প্রথম কথা। তারপর কবে যে আপনি থেকে তুমি, 'তুমি' হয়ে গেলে, কবে যে আমার প্রিয়জন, আমার দিদি, আমার আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম, হয়ে উঠেছো আমি আজ আর হিসেব করে বলতে পারবোনা। তোমার পোষাকী নামটা রেডিওতে ঘোষণার সময় বলতাম মাত্র। চিরকালই তুমি আমার 'বাচ্চুদি'। এই নামটায় সংগীত জগতে এক বাক্যে চেনা যায় তোমাকে। রবীন্দ্রসদন মঞ্চে অনেক আলোর সামনে তোমার 'পূজা' পর্বের গান শোনা—এক বিরল অভিজ্ঞতা। কবির কথার অর্থটা বুঝতে পারি তোমার গানের শেষে। "কথা যেখানে শেষ—গানের শুরু সেখানেই।" সত্যিই তোমার গানের পর কারো সংগে কথা বলতে ইচ্ছে করতো না। কারণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে ফিরতাম তোমার গান শুনে। মাঝে মাঝে রাগ হত তোমার ওপর। কত অনুষ্ঠানে তুমি আসতেনা। শান্তিনিকেতনে তোমার ক্লাস, তোমার ছাত্রছাত্রী, তোমার সংসার, তোমার নির্জনতা, তোমার আত্মমগ্নতা ছেড়ে কোলকাতার মঞ্চে তুমি আসতে চাইতে না। তবু কোলকাতায় এলে বেশীর ভাগই নির্বাচন করতে পূজা পর্বের গান। ঐ গানেই তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে। রবীন্দ্রনাথের কথা গুলো তোমার সম্পর্কে সব মিলে যায়। "ভৈরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রি শেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গ বিহীন

অসীমের চিরবিরহ বেদনা. মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তনিশ্বাস, পূরবী যেন পুণ্যচারিণী বিধবার সন্ধ্যার অশ্রুমোচন—।" রাগ রাগিনী সম্পর্কে কবির অনুভব যেন তোমার গানে বিচ্ছুরিত হতে থাকে আরও গভীরতা নিয়ে।

আমার বেশ মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে লেখা অমিয়দার বইটা তুমি আর অমিয়দা (অমিয় সেন) আমার হাতে তুলে দিলে। তার ক'দিন পরেই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটল। কোলকাতায় সরকারী কাজে এসে গাড়ীর মধ্যেই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন অমিয়দা। তার পরে তোমার শান্ত শোক স্তব্ধতায় আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। মৃত্যুকে তুমি কত সংযত মন নিয়ে দেখেছো। যা আমাদের অনিবার্য পরিণতি তাকে নিয়ে তোমার বাইরের কোনো প্রকাশ সেদিন দেখিনি। বুঝেছিলাম তুমি গুরুদেবের এক মানস কন্যা। তাই এই শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই তোমার পাওয়া। বাইরে একটা শান্ত, সমাহিত, স্নিগ্ধ, অথচ অসীম উদাস তোমাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মুকুট পরিয়েছে। তাই তোমার নিজের রোগ যন্ত্রণার কথা কারোকে বেশী জানতে দিতে না। শতবর্ষের পৌষ মেলায় ভোরে—রেডিও থেকে গিয়েছিলাম ধারা বিবরণী দিতে। একক গানে তোমায় বসতে হল মঞ্চে। তোমার শরীর তখন বেশ খারাপ। অথচ কি অনায়াসে গাইলে—"হৃদয় আমার প্রকাশ হল।" কণ্ঠে কোথাও এতটুকু যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। গুরুদেবের গানের মধ্যে ডুবে তার শিকড়ে, শাখা-প্রশাখায়, ফলে-ফুলে, পল্লবে, সঙ্গীতের আকাশ স্বকীয় মহিমায় সেদিন উদ্ভাসিত হল—এ স্মৃতি ভুলবোনা। এমনিই তোমার গান। আমি আর গৌরী যতবার শান্তিনিকেতনে যাই, তোমাকে ভোর বেলা দেখতে যেতাম। মাঝে মাঝে কয়েকদিন প্রাতঃ ভ্রমণে বের হতে। গিয়েও দেখা পাইনি। শেষ বার তোমার হাতে দেওয়া চা-খাবার খাওয়ার স্মৃতি কোনো দিন ম্লান হবে না। সেই আন্তরিক যত্ন ভোলবার নয়। সামনের বাগান পেরিয়ে, নুড়ি বিছানো পথ পেরিয়ে গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলে আমাদের। গৌরীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলে। সেদিন কি জানতাম—তোমার কাছে সেই আমাদের শেষ যাওয়া? তারপর কোলকাতায় তোমার চিকিৎসা। সারা দেশ প্রার্থনা করছে তোমার জীবন। সকলের সব চাওয়া তুচ্ছ করে কত সহজে চলে গেলে নীরবে ধূপের মত শেষ হয়ে। রবীন্দ্র সদনে বহু জনতার ভীড়ে তোমার অন্তিম শয়ান যে দেখতে হবে কোনো দিন ভাবিনি। তোমার সৌম্য শান্ত মূর্তি একবারও জিজ্ঞাসা করল না সেদিন—'কেমন আছ পার্থ? গৌরী কেমন আছে?' □

তথ্য সংযোজন :

নীলিমা সেনের জন্ম ১৯২৮ সালে কলকাতায়। বাবা ললিতমোহন গুপ্ত, মা পঙ্কজিনী দেবী। ছ' বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দিদি পারুল সেন এবং জামাইবাবু ধীরেন্দ্রমোহন সেনের তত্ত্বাবধানে নীলিমা (বাচ্চু) বড় হয়ে ওঠেন। পাঠভবনে ছোটবেলা থেকেই নাচে, গানে, খেলাধুলায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯৪১ সালে রেগজিস্ট রবীন্দ্রনাথের মুখে 'গানের এই ঝর্ণাতলায়' গেয়ে হাসি ফুটিয়েছিলেন। উদয়নের বারান্দায় ১৩ বছরের সেই কিশোরীর গানের সাথে এস্রাজ বাজিয়েছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। গানকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করার বাসনায় প্রবেশ করেন সঙ্গীতভবনে। সঙ্গীতভবন থেকে স্নাতক হতেই তাঁর প্রথম রেকর্ড বেরোয় 'আমার দোসর যে জন' এবং 'বেলা বয়ে যায়' (১৯৪৪)। বরাবর শান্তিনিকেতনে থাকার সুবাদে শিক্ষক হিসাবে নীলিমা পেয়েছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, অমিতা ঠাকুর, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ার প্রমুখের সান্নিধ্য। তবে তাঁর নিজের কথায় 'আমার গানের গুরু বলতে শ্রদ্ধেয় শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নামই সর্বাগ্রে মনে হয়।'

১১৫০ সালে ২২ বছর বয়সে নীলিমা বিয়ে করেন ডঃ অমিয়কুমার সেনকে। ১৯৫১য় স্বামীর সঙ্গে প্রথম বিদেশ যাত্রা (আমেরিকা)। সেখানে সোসিওলজি পড়েছেন আবার চিকাগো, মিচিগান প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতও পরিবেশন করেছেন। ডঃ সেন ছিলেন বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রার। ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নীলিমার জীবন বৃত্তে থাকেন শুধু মেয়ে, জামাই ও নাতি। একমাত্র সন্তান নীলাঞ্জনা (ছুয়া) সুগায়িকা।

১৯৯০ সালে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা হিসাবে নীলিমা অবসর নেন। এ বছর জানুয়ারী মাসে কিডনীর অসুস্থতায় কলকাতার উডল্যান্ড নার্সিং হোমে ভর্তি হন। গত ২৮শে জুন সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। পরদিন পূর্ণ সরকারী মর্য্যাদায় কেওড়াতলায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। —সম্পাদক

● বইপত্র

□ নির্বাচিত কবিতা / বিজয় কুমার দত্ত / প্রমা / ২৫ টাকা

গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং হৃদয়ানুভবের বিশ্লেষণী মননশীলতা একজন কবির কবি সত্তায় উত্তরণের মূল মন্ত্র। কবি বিজয় কুমার দত্ত অনুভূতি এবং আন্তরিক সমাজ চেতনায় পাঠক হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছেন। কবির শব্দচয়ন কখনও কখনও আভিধানিক শব্দার্থের অবয়ব থেকে বেরিয়ে এসে গূঢ় অর্থের নবদ্যুতিতে পাঠককে এক অপার্থিব মোহময় জগতে নিয়ে গেছে। সেখানে শব্দের ব্যাকরণগত অনুশাসন থেকে বেরিয়ে এসেছেন—কারণ শব্দের অনন্ত দ্যুতির জন্যই শব্দব্রহ্ম।

'নির্বাচিত কবিতা'য় চমকের চেয়ে জীবনের গভীরতাই স্পষ্ট। জীবনকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে শুধু উপলব্ধির চেষ্টা নয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও মেধাকে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন এখানে। কবিতার সূত্রধরে কবি স্পর্শ করতে চেয়েছেন মানুষের চেতনাকে কিছুটা অন্তর্বেদনায় কিছুটা ঘটনার স্মৃতিতে তাই 'তিন প্রহরের চেতনায়' মানুষের গ্রিন্তর বেদনার উল্লেখ করেছেন। 'সমস্ত মূর্খের দিন পয়লা এপ্রিল কেন মূর্খেরাও জানে' একটা অনায়াস সূক্ষ স্যাটায়ারের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের ক্ষতচিহ্ন জ্বলে ওঠে জীবন চৈতন্যে। সামাজিক ন্যায় অন্যায় বাঁচা সংগ্রাম এবং হতাশা 'বাঁচার চেয়েও সত্য মরে যাওয়া…'/ 'অথচ স্বপ্নের বুকে অলীক ছায়ার মতো প্রতিশ্রুতি সার' অনেক বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তাঁর আলোচ্য কবিতায়। মানুষের জীবন যাপনের সংবেদন আবেগ, জাগতিক দুঃখ সুখ বেদনা আঘাত প্রভৃতি আরও সংলগ্ন হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

অকারণে শঙ্কা প্রিয়জনের ধর্ম। তাই 'কাছে এসে ভয় করে / পাছে তুমি নত কণ্ঠস্বরে / তোমাকে চিনি না বলে অপরিচয়ের মূঢ় নিষ্ফল পর্দায় / হঠাৎ অদৃশ্য হও।' কবির বুকের মধ্যে একটা ভালবাসার স্বপ্ন—কিন্তু সেই স্বপ্নেও ভয়, যদি ভালবাসার জন মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাই অনুভবের মগ্ন বাসনায় দেখতে চায় তার হৃদয়কে তার ভেতরকে। ওয়েট মেশিনে দেহের ওজন এবং কম্পিত নিয়তি নির্দেশ জানা যায় যান্ত্রিক কায়দায়। কিন্তু কবি খোঁজেন অন্য যন্ত্রের ঠিকানা। বন্ধুর মুখ, প্রিয়ার পরিচিত চোখ ও মুখশ্রী যাতে নিক্তির মত ওজন করা যাবে বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপ প্রিয়ার বুকের গহিনে আবৃত

ভালবাসার স্বপ্ন।…'আমি সেই যন্ত্রের লিখনে / জেনে নেবো—হৃদয়ের কতটুকু ভার আছে অথবা জীবন / শারীর চেতনা ভুলে মনে রাখে কিনা হৃদয়ের অবহ ওজন।'

সমাজ সাময়িকতার চাপ এবং জীবন যাপনে প্রতিদিনের রক্তক্ষরণে কবিহৃদয় বিদীর্ণ হয়। তখন দেশ কাল পরিবৃত ও পরিব্যাপ্ত জগৎ থেকে অন্তর্লোকে বিচরণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। 'জীবনের অনুচ্ছ্বাস নশ্বরতা নিশ্বাস বাতাসে / ছুটে আসে. আরো কোন অভিজ্ঞান নতুন অভিধা / …ভালবাসা এতস্বাদ. এতগন্ধ, এমন অমল / বিশ্বাসের ঘর বাঁধে—জানা হয় আজ'—একটা অদৃশ্য ক্ষত যা বুকের গভীরে কবি কর্কট যন্ত্রণার মত বয়ে বেড়াচ্ছিলেন—তা বিশ্বাসে আত্মপ্রত্যয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে।

বিজয় দত্ত যথার্থ কবির মতই নিজেকে সময়ের সঙ্গে মানুষের চেতনা চৈতন্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি বরং মানুষের আত্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তার কবিতায়।

'জীবন হয়তো সত্যিই ফুরোয়নি, কিন্তু যা ফুরিয়েছে / তার বদলে জীবন ফুরালে ঢের ভালো হত।" আজকের বিপন্ন সময়ে স্বকালের হৃদয় হীনতা কবিকে বেদনাহত করে। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলে ওঠেন—'…জীবন ফুরোলেই / হয়তো আরো এক নতুন জীবনের / কাছাকাছি চলে যাওয়া যেত।'

সন্দেহ কি এমন কবিকেইতো স্বতস্বভাবে মনে রাখা যায়।

প্রভঞ্জন হালদার

□ নিজস্ব ভূমিকা / সুবোধ সেনগুপ্ত / পরিবেশনা দে'জ / কুড়ি টাকা

কবিমনের নিভৃত তলদেশে বয়ে চলেছে বিষন্নতার এক ফল্গুধারা, যা তাঁর অনেক কবিতায় বিচিত্র আঙ্গিকে বিধৃত। যেমন, 'স্বচ্ছ' কবিতায় তারই আভাস —'আনন্দ ঝলসে ওঠে / দুঃখের এক বোবা কান্না / দৃষ্টির সারল্য কাড়ে / ছায়ায় সে নিজেকে হারায়।' আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক সমাজের দেউলিয়াপনা মানুষকে পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে আত্মসুখের তাড়নায়। আর আমাদের দুঃখ-কষ্টগুলো কেবলই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। কি জানি কেন, 'সূর্য' কথাটি কবির যেন খুবই প্রিয় এবং প্রয়োজনীয়, অধিকাংশ কবিতায় যা উপমান, উপমিত অথবা রূপকার্থে ঘুরেফিরে এসেছে। অবশ্যই কাব্য-সুষমার স্বার্থে। সুতরাং বলা যায়, কাব্যগ্রন্থটিতে মানবজীবনের রিক্ততা ও শুষ্কতা জনিত বিষন্নতাবোধ এবং সূর্যের প্রতীকে উত্তাপ-আলোক-শক্তির আনন্দ-ময়তা যেন পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। কবির কাব্য মানসিকতায়

বারবার এসেছে 'সূর্য' কথাটি নানা প্রতিভাসে, আবার বিষণ্ণতা বোধের আর্তিও তাকে কম ব্যাপৃত করেনি।

কাব্যগ্রন্থটিতে মোট কবিতা আছে পঁচানব্বইটি। একটি মাত্র বড় কবিতা ('যাত্রা'—৯২ পাতা)। বেশীর ভাগ কবিতা মাঝারি আকারের। কিছু কবিতা অবয়বে অতি ক্ষুদ্র। যেমন,—সুর, গ্রেপ্তার, আততায়ী, প্রিয়, শেষ কিছু, বোধ ইত্যাদি।

কবিতাগুলির উপজীব্য বহুবিধ। সমাজ-সংস্কৃতি, নারী-পুরুষ, রাত-দিন, দুঃখ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, কান্না-ঘাম-রক্ত, নিসর্গ-চেতনা যেমন বিষয়ীভূত, আবার কখনও ভেসে উঠেছে গভীর চিরন্তন দার্শনিক ভাবনা।

অধুনা কবিতার বাজার নেই। অনেকেই কবিতা পাঠে বিমুখ। কারণ আধুনিক বাঙলা কবিতার দুর্বোধ্যতা এবং অসমগোত্রীয় শব্দচয়নের অর্থগত ধোঁয়াশাজনিত হেঁয়ালীপনা। এ গ্রন্থও সে দোষে কিছুটা দুষ্ট। তবে কিছু সহজ-সুন্দর কবিতা আছে। যেমন,—'সসীম', 'কবিকথা' (কবিতা তাকেই বলি / হোক না সে বস্তি ফুটপাত), 'নিজস্ব ভূমিকা'। কিছু উল্লেখযোগ্য অনবদ্য কবিতাও কবি সৃষ্টি করেছেন, যা আগ্রহ তৈরী করে এবং আমাদের অভিনিবেশ দাবী করে। যথা :—সুবর্ণ বণিক, ১৯৯০, কণ্ঠধ্বনি, বিষম, অন্তিম, পর্যটক, আরো কিছু কবিতা।

পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতা একটিও নেই। 'বাসন্তি' ও 'পূর্বাহ্ণ' ছাড়া পূর্ণ রোমান্টিক কবিতারও অভাব। তবুও বইটিতে মোটের ওপর কবির মৌলিক দৃষ্টিকোণ, অনুভূতির গভীরতা ও তীব্রতা ধরা পড়ে। সাঙ্কেতিকতা, অনুকল্প ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবি দক্ষ। কবির কাব্যমানসে বিষাদ ও ভালোবাসার মেরুকরণ ঘটেছে।

বই ছাপানোর ক্ষেত্রে নিখুঁত সম্পাদনার কথা সম্প্রতি ভাবা হচ্ছে। বাঙলা বই নিয়ে রসিকতা করা হয়, এ বই ছাপা হয় কেনার জন্যে, পড়ার জন্যে নয়। আলোচ্য গ্রন্থটিতেও সুষ্ঠু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। প্রচ্ছদ-শিল্পী চারুখান মশাইকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েও বলতে হচ্ছে, প্রচ্ছদের চারুকৃতি অতি মাত্রায় ভাবময়, বিমূর্ত এবং দুর্বোধ্য।

পুস্তক প্রকাশের 'কনভেনশন' বা চিরাচরিত প্রথার বাইরে এসে তেমন বিশিষ্ট ও অনন্য হয়ে উঠতে না পারলেও বইটিতে কবি তাঁর নিজস্ব ভূমিকা পালন করে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, এ ঋণ স্বীকার করতেই হবে।

স্বর্ণকুমার পালধী

□ ছিটমহল / শুভ জোয়ারদার / লোকমুদ্রণ (বালুরঘাট) / ২৫ টাকা

ছোট নদীকে স্থানবিশেষে বলা হয় ছড়া। প্রকৃতির এই ছড়ার সঙ্গে সাহিত্যের ছড়ারও একটা মিল আছে। ছড়া আয়তনে ছোট, কিন্তু নদীর মতই কলধ্বনি ও বহতা শক্তি ধারণ করে। একালের ছড়ার রাজা অমিতাভ চৌধুরীর কথায় বলতে পারি 'ছড়ায় থাকে বক্তব্যের নির্যাস, থাকে অন্ত্যানুপ্রাসের চমক এবং একটা কিছুতে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা।' এই 'একটা কিছুতে ধাক্কা' দেওয়ার ব্যাপারটা না থাকলে মনে হয় ছড়াটা বদ্ধজলায় পরিণত হল। নদী মজে গেল।

শুভ জোয়ারদারের ছড়া এদিক থেকে জীবন্ত নদীর মতোই। বহতা শক্তির সাথে তার মধ্যে রয়েছে মিলের কলধ্বনি এবং দুপারের উপলখণ্ডে ধাক্কা দেওয়ার দুরন্ত ক্ষমতা। আশির দশকের গোড়ার দিকে তাঁর প্রথম ছড়ার বই 'ছড়া এলো পাথাড়ি' হাতে এসেছিল। তখনই মনে হয়েছিল, সুরকার গীতিকার ও চিত্রকর এই মানুষটি একজন সার্থক ছড়াকারও বটে। সে সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'বাংলা ভাষায় আমরা আর একজন অত্যন্ত শক্তিমান ছড়াকারকে পেলুম।' বারো বছর বাদে প্রকাশিত 'ছিটমহল'-এর শেষ পৃষ্ঠায় সুনীলের সেদিনের পুরো বক্তব্যটুকুই মুদ্রিত আছে।

লেখকের অনুভবে ছিটমহল অবাস্তব কোন মুলুক নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনবৃত্তেই তার অবস্থান। সেখানে প্রতিমুহূর্তে সংঘটিত অজস্র অসংগতিই এ লেখার মূল উপজীব্য। আর বর্তমান সময় ও সমাজ সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা কমবেশী সব ছড়াতেই প্রতিফলিত। বিশেষ করে 'হাসির পারমিট' 'কখন কি করতে হবে', 'খিদে পেলে', 'ছিটমহলের পুলিশ', 'ছিটমহলের শিল্পকলা', 'মগজবাজি' প্রভৃতি ছড়াগুলি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শুভ যখন লেখেন,

'নাতি যখন ষোলয় পড়েন বুদ্ধিরা যায় উপে
আবার তিনি দাদু হলেই আসবে চুপে চুপে
(মগজবাজি)

অথবা, 'বদন আমার গোমড়া হলেও হাসতে ভীষণ ইচ্ছে
কিন্তু দেশের আইন কানুন হাসতে কি আর দিচ্ছে ?'
(হাসির পারমিট)

কিংবা, 'পুলিশ ও ভাই পুলিশ কোনদিকে তুই দুলিস ?
ডানচোখটা পিটপিটিয়ে বামটা কেন খুলিস ?'
(ছিটমহলের পুলিশ)

তখন নিরাবরণ কিছু সত্যই যেন হালকা রসে সিক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। আর পাঠকের কপালের ভাঁজ স্পষ্টতর হয়।

বইটির শেষ মলাটে লেখকের ছবির সাথেই ছাপা 'বাঙলা সাহিত্যে খেয়াল-রসের কারবারী সুকুমার রায়ের পরে অবশেষে এসেছেন শুভ জোয়ারদার' কথাটা পাঠককে কিঞ্চিৎ চমকিত করতে পারে। বাঙলা সাহিত্যের গোড়ায় ছড়ার প্রচলনই বেশী ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুসদয় দত্ত, সুনির্মল বসু ছড়া সাহিত্যে নতুন মাত্রা এনে দেন। সুকুমার রায়ের হাতে ছড়ার যুগান্তকারী উৎকর্ষ সাধিত হয়। একই সময়ের বৃত্তে এবং উত্তরকালে অসংখ্য লেখক সাহিত্যের এই ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন, এখনও করছেন। অন্নদাশংকর রায়, অমিতাভ চৌধুরী, লীলা মজুমদার, হরেন ঘটক প্রমুখের অবদান বাঙালী পাঠক অস্বীকার করতে পারে ? উত্তরকালের লেখকের উপর অগ্রজ লেখকদের ঋণ কোন না কোন ভাবে থেকেই যায়। ছিটমহলও সে অর্থে ঋণমুক্ত নয়। তার 'খাদা আইন', 'ছিটমহলের চাবি', 'কাতুকুতু সেন', ঘুটঘুটি বুড়ো', 'ছিটমহলের রাজা' কি যথাক্রমে সুকুমার রায়ের 'একুশে আইন', 'ঠিকানা', 'কাতুকুতু বুড়ো', 'কাঠবুড়ো'. এবং 'বোম্বাগড়ের রাজা'কেই অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয়না ? অনুরূপভাবে এ বইয়ে অমিতাভ চৌধুরীর উপস্থিতিও অনুভব করা যায়

মোট ৪১টি ছড়া এবং ২৯টি ছবি নিয়ে অফসেটে ছাপা বইটি উজ্জ্বল মলাট-শোভিত। লেখকরুত মলাট ও অলংকরণে সমৃদ্ধ বইটি ছোট বড় সকলেরই উপযোগী। □

—সাগর বিশ্বাস

কবিতা সীমান্ত প্রকাশনী
সমর্পন মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

ফিরে আসি কোলাহলে

বইমেলা ১৯৯৭-এ প্রকাশিত হবে।

ASHOK ENTERPRISE

Timber Merchants, importers
& general order suppliers

Rail gate No. 6, Bishnupara
North 24 Parganas.

ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত
বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের

জনকল্যান প্রকল্প

- দাতব্য চিকিৎসালয় (অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি)
- অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- কুটির শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান
- প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণ

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ

দক্ষিণ কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা

EKUSH SHATABDI

A distinctive Bengali periodical ☐ DL No. 04/96
Vol. 1 ● No. 3 ● July—September 1996 ● Rs. 10

বিংশ শতাব্দী
শেষ হবার আগেই

একুশ শতাব্দী

পরিকল্পিত
বিশেষ সংখ্যা

● তারাশঙ্কর
● জীবনানন্দ
● নজরুল ইসলাম

লেখক গ্রাহক বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দাতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা
কাম্য

ডালিয়া রায় কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন-২১ নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত।

একুশ শতাব্দী

শতবর্ষের আলোকে
চলচ্চিত্রের সেকাল একাল ভাবীকাল
বাঙলা চলচ্চিত্রের এইসময়

প্রসঙ্গ : বইমেলা
কলকাতায় পিট সীগার—অতীত ও বর্তমান

স্মরণের আবরণে
অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় □ শীলিমা হালদার

সাক্ষাৎকার
শওকত ওসমান (বাঙলাদেশ)
গল্প □ কবিতা □ বইপত্র

With best compliments from :

N. K. AGARWAL

একুশ শতাব্দী

(কার্তিক—পৌষ-১৪০৩)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়-৫

প্রবন্ধ / নিবন্ধ

শতবর্ষের আলোকে চলচ্চিত্রের সেকাল একাল ভাবীকাল ☐ শতদ্রু চাকী ৭
বাঙলা ছবির এই সময় ☐ বিপ্লবকুমার ঘোষ ১৪
প্রসঙ্গ : বইমেলা ☐ অমলেন্দু ঘোষ ১৮
ফুলগুলি সব গেল কোথায় ☐ কিশলয় সেন ২১

গল্প

কার্যকলাপ ☐ মৃদুলকান্তি দে ২৫
জীবিকা সংবাদ ও অন্যান্য ☐ উৎপলেন্দু মণ্ডল ৩২

কবিতা

জুল সুপেরভিয়েল ৩৮ ☐ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য ৪০ ☐ শচীন দত্ত ৪১ ☐ সৌমিত বসু ৪১ ☐ ব্রত চক্রবর্তী ৪২ ☐ বিজয় কুমার দত্ত ৪২ ☐ চিত্তরঞ্জন হীরা ৪৩ ☐ সুগত মুখোপাধ্যায় ৪৪ ☐ সুমিত্রা দত্তচৌধুরী ৪৫ ☐ সুদীপ্ত বিশ্বাস ৪৫ ☐ সুশীল কুমার চক্রবর্তী ৪৬ ☐ অরিন্দম দত্ত ৪৭

সাক্ষাৎকার

শামসুজ্জোহা মানিক ☐ সাগর বিশ্বাস ৪৯

স্মরণের আবরণে

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ পার্থ ঘোষ ৫৫
নীলিমা দাস ☐ সলিল সরকার ৫৭

বইপত্র

পণ্যসংহিতা ☐ তারাপদ আচার্য ৫৮
কবিতা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ☐ সমর্পণ মুখোপাধ্যায় ৬১
অবনের কয়েকটা দিন ☐ স্বর্ণকুমার পালধী ৬৩

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

নব শিশু নিকেতন

বিশরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
প্রধান শিক্ষক : বাদলচন্দ্র গুড়িয়া

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের

জনকল্যান প্রকল্প

- দাতব্য চিকিৎসালয় (আলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি)
- অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- কুটির শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান
- প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসন নির্মাণ

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ

দক্ষিণ কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা
প্রতিষ্ঠাতা : ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী

With Best wishes from

M/s Pandey Travels

'Shantiniketan'
8, Camac Street, Calcutta-700017
Ph. No. 242-3890

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

(অক্টোবর—ডিসেম্বর ১৯৯৬)

সম্পাদক ☐ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী ☐ সুমিতা দস্তচৌধুরী

প্রভঞ্জন হালদার, অরিন্দম দত্ত

উপদেষ্টা ☐ অমিতাভ চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী

যোগাযোগ :—

এন-২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

একুশ শতাব্দী

তারাশঙ্কর সংখ্যা

অক্টোবরে প্রকাশিত হবে

লিখছেন : তারাপদ আচার্য, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, কমল মোমিন (ঢাকা), সুমিতা চক্রবর্তী, আরো অনেকে।

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ॥ বড়দিদি ৮·০০ ॥ পরিণীতা ৮·০০ ॥ চন্দ্রনাথ ৯·০০ ॥ পল্লী-সমাজ ১০·০০ ॥ বিরাজ বৌ ১২·০০ ॥ অরক্ষণীয়া ৮·০০ ॥ বামুনের মেয়ে ১০·০০ ॥ গৃহদাহ ১৮·০৯ ॥ গল্পসংকলন ১৮·০০ ॥ নিষ্কৃতি ৮·০০ ॥ স্বামী ৮·০০ ॥ পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ॥ নববিধান ৮·০০ ॥ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৫·০০ ॥ রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ॥ কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ॥ মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ॥ দত্তা ১৫·০০ ॥ চরিত্রহীন ২০·০০ ॥ পথের দাবী ১৮·০০ ॥ কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ॥ প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ॥ নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ॥ বিজয়া ১০·০০ ॥ রমা ৯·০০ ॥

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ॥ পথের দাবী ২০·০০ ॥ চরিত্রহীন ২২·০০ ॥ দেনা পাওনা ১৮·০০ ॥ শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ॥

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ॥ সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ॥

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৫০-৯৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সম্পাদকীয়

পিট সীগারের প্রতি কলকাতার 'আনন্দলোক' নামক একটি বিচিত্র পত্রিকার ততোধিক বিচিত্র লেখকের প্রশ্ন "আপনি কলকাতায় এসেই সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ি গিয়েছিলেন এবং পুত্র সন্দীপ না থাকা সত্ত্বেও ঘন্টাখানেক সময় সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া দেবীর সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন। কী উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন ?" (অধোরেখা আমাদের)।

এরকম কুরুচিকর একটি প্রশ্ন পিট সীগার কেন, পৃথিবীর অতি সাধারণ কোন মানুষকেও করা যায় না যদি বিন্দুমাত্র শালীনতা বোধ থাকে। 'আনন্দলোক' প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ঘটা করে ছেপেও বের করেছে। অন্যদিকে তার প্রমোটার 'আনন্দবাজার' কলকাতা তথা ভারতবর্ষে পিট সীগারকে নিয়ে যাবতীয় অনুষ্ঠানের খবর চরম অবহেলায় ব্লাক আউট করেছে। আনন্দবাজারের অতীত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি ভূমিকা এবং বর্তমান মৌলবাদ বিরোধি দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক দিকগুলি বিস্মৃত না হয়েও বলা যায়, পিট সীগারের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীর অনুষ্ঠানের যথোচিত কভারেজ না দিয়ে সে শুধু সংবাদপত্রের প্রচলিত নীতির বিরোধিতাই করেনি, সংবাদ হত্যার পাপেও নিজেকে কলঙ্কিত করেছে। তার লক্ষ লক্ষ পাঠকের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

আর পিট সীগার, এই সময়ের কিংবদন্তী হয়ে ওঠা বিশ্বশিল্পী, যিনি পৃথিবীর আপামর মানুষকে রক্ত সম্পর্কেও আপন বলে ভাবেন, আনন্দলোকের অসংযত প্রশ্নেও, দৃশ্যত, কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না। কিন্তু আমাদের কৌলীন্যের বারুদে ঠাসা লেখক শিল্পী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা ? যেখানে কথায় কথায় মসী উদ্গীরিত হয়, পান থেকে চুন খসলে যেখানে আক্রমণের লৌহ শলাকা শানিত হয়ে ওঠে, সেখানে বিশ্ববন্দিত এক শিল্পীর প্রতি 'সংস্কৃতিনগরী' কলকাতার মাটিতে ওই বিকৃত প্রশ্নে বিবেক আহত হয় না ?

গ্রাম বাঙলায় একটি প্রবাদ আছে, 'হাগুনেতির লাজ নাই, দেখুনেতির লাজ'। প্রশ্নকারী ও তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থকদের লাজ লজ্জা থাকুক আর না-ই থাকুক, আমরা মনে করি, এ আমাদের লজ্জা, বাঙলার সমস্ত লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীর লজ্জা—রবীন্দ্রনাথের যে বাঙলার জন্য স্বয়ং পিট সীগারেরও বুক ভরে ওঠে।

১১ নভেম্বর বাঙলা আকাদেমি চত্বরে যা হলো, সেও কি কম লজ্জার ? ভারতের ছাত্র ফেডারেশান ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশান সেদিন শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানালেন আকাদেমির সভাঘরে যেখানে সাকুল্যে দুশোর বেশি মানুষের

স্থান সংকুলান হয় না। ৪৫ মিনিটের সেই অনুষ্ঠানে ক্যালকাটা কয়ারের 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখোনা বেধে আমায়' (সুর-কমল দাশগুপ্ত) এবং সলিল চৌধুরীর সুরে 'আয়রে আয়' গান দুটিই ছিল প্রধান। সীগারের কোন অনুষ্ঠান ছিল না। কিন্তু তাঁকে কাছে থেকে দেখার অদম্য আশা নিয়ে যে অগনিত তরুণ তরুণী সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের নব্বই ভাগই ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। রাজ্যের বৃহত্তম ছাত্র-যুব সংগঠনের কর্মকর্তারা কি জানতেন না যে প্রচার যত সামান্যই হোক না কেন দু'চার হাজার অনুরাগী মানুষের উপস্থিত হওয়াটা অসম্ভব নয়? যদি জানতেন তবে সম্বর্ধনার স্থান হিসেবে বাঙলা আকাদেমির সভাঘর বেছে নিলেন কেন? সেদিন এই প্রজন্মের যে অনুরাগীর দল ভাঙা বুক নিয়ে ফিরে গেলেন, তাঁরা কি আর কোনদিন সীগারের মুখোমুখি হবার সুযোগ পাবেন? এ লজ্জা কাদের? আমাদের নয়? □

Space donated by

A well wisher

With best wishes from

R. Krishnan

শতবর্ষের আলোকে

চলচ্চিত্রের সেকাল একাল ভাবীকাল

শুভ্রু চাকী

প্রাক চলচ্চিত্র যুগের সুবিদিত যে সব শিল্প, এই যেমন নৃত্য গীত নাট্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য কাব্য কথাশিল্প প্রভৃতি, সে সবেরই উদ্ভব সুদূর অতীতে। ফলত, এই সব শিল্পের কোনো শতবর্ষ বা অনুরূপ কোনো পূর্তি উৎসব ইত্যাদি কোথাও কোনো যুগে এই রকম ঘটা করে পালিত, উদ্‌যাপিত হয়েছিল কিনা সে আমাদের জানা নেই। স্মরণ বরণের বিষয়টা ঐ সব শিল্পের ক্ষেত্রে ঘটেছে, মূলত, সেই সব শিল্পের যাঁরা দিকপাল প্রতিভূ—স্রষ্টা, তাঁদেরই প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সূত্রে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ঘটনাটা কেন অনেকটাই অন্য রকম হলো, প্রায় যেন একটা ব্যতিক্রমের মতো ?

সেকি শুধু কোনো অভিনবত্বের খাতিরে ? নাকি তার পেছনে মানব মনের ওপর এর প্রভাব প্রতিপত্তির তথ্যটাই, মুখ্যত, হিসাবে রাখা হলো ? এবং এটা অনস্বীকার্য যে এই মানদণ্ডে অন্তত, পূর্বকালীন কোনো শিল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো তুলনাই চলে না। বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয় যদি কিনা প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি গোছের কিছুটা অস্পষ্ট পদ, পরিভাষার বদলে সটান 'জনপ্রিয়তা' কথাটাই প্রয়োগ করা হয়। এবং সেই নিরিখে অন্তত সিনেমার যে কোনো জবাব নেই, তার প্রমাণের জন্য বিশেষ কোনো কূটতর্কেরও প্রয়োজন হয় না। এটা বোধ করি খুব অনভিপ্রেত হবে না যদি, জনপ্রিয়তার ঐ তথ্যটিকে অঙ্ক বা axis-এ রেখেই মোটামুটি—শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে—সিনেমা নামক এই শিল্পটির কিছু হিসাব নিকাশের দিকে যাওয়া যায়। চলতি কথায় যাকে

বলে সালতামামি। ফলত যা কিনা হতে পারে শিল্প হিসেবেও এর কতটা কি মূল্য আছে তারও একটা মূল্যায়ণের মুখবন্ধ।

একটা প্রশ্ন অবশ্য আছে এখানে। ছবিকে 'সচল' করে তোলার 'আর্ট' আর 'টেকনিক'—শিল্প আর কলাকৌশল—একটা সময় পর্যন্ত সে সবই ছিল কিন্তু সিনেমারই একান্ত এক্তিয়ার। পরে পরে এলো টিভি, ভিডিও এই সব। বৈদ্যুতিন নানা মাধ্যমের জয়যাত্রা। রীতিমত একটা কোণঠাসা অবস্থার মাঝখানেই যেন পড়ে গেল সিনেমা। জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী একদার ঐ প্রযুক্তিপুষ্ট লোক-শিল্পটি। পোষাকি ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে চলচ্চিত্র। আর এর সুবাদেই ঘনিয়ে এলো বিপদ। হালফিলের ঐ সব মাধ্যমের কাছে এ যেন হেরে না যায়, সেকেলে বলে ক্রমে পরিত্যক্ত না হয়। অর্থাৎ জনপ্রিয়তার ঐ জায়গাটি সিনেমাকে ধরে রাখতেই হবে। যে ভাবেই হোক আর যেমন করেই হোক।

অথচ তলীয় শক্তির নিরিখে, যাকে বলে potentiality বিচারে সিনেমার চেয়ে আধুনিক আর কি মাধ্যম হতে পারে? এর যে কি অসম্ভব ক্ষমতা, সত্যি বলতে কি, তার কতটুকুই বা উদ্ঘাটিত হলো। বিগত একশো বছরে বহু, বহু অগ্রগতি ঘটেছে সিনেমার জায়গায়। নানা দিক দিয়েই, নিঃসন্দেহে। তবু কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি আরো বিস্ময়কর, আরো অভূতপূর্ব বহু শিখর জয়ের সম্ভাবনা। এ নিয়ে বস্তুতই কতটা কি ভাবছে আজকের সিনেমা? অন্তত এই রকম একটা চমৎকার উপলক্ষ্যই যখন পাওয়া গেল তখন তো এসব ভাবনাই বেশি বেশি করে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। সে জায়গায় ঘটছেটা কি: অন্তত বাঙ্গবে? সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। আর নতুনত্বের নামে? মূলত চোখধাঁধানো যত টেকনিকের ভোজবাজি! আন্দাজ করা যায়, এই রকম একটা ব্যয়বহুল মাধ্যম, কোথায় যেন একটা টাকাকড়িগত চাপের হিসেবটাই কাজ করছে কিছুটা, অতিচ্ছন্ন এই সব ব্যাপার স্যাপারের পিছনে। কারণ একটা survival এর প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে এখানে। যে জিনিসের তাগিদে আজ মরীয়ার মতই ঝাঁপিয়ে পড়ছে সিনেমা, আগাপাস্তালো এক ধরণের পণ্যীকরণের দিকে। যে পণ্য বিকোবে। এবং বিকোবেই। আর এর ক্রেতা হবে কারা? জনতার সবচেয়ে গড় রুচিসম্পন্ন যে অংশটি, মূলত তারাই। যাদের সম্পর্কে ধরেই নেওয়া হবে, চাহিদা তাদের যতটা জৈব শারীরিক, মোটেও ততটা মানসিক নয়। তার চিৎবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তির ওপর যে যথেচ্ছাচারই চলুক না কেন—একেবারে আকাড়া, অচেতন এবং আধা বর্বর অবস্থায় মানুষ বলতে যে 'মানুষ'কে

বোঝায় —সেই অবস্থায় তার যে সমস্ত চাহিদা, পণ্যসিনেমা যেন সে সব চাহিদারই কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে। চাহিদা যোগানের এই কুটচক্রে পড়েই সিনেমা —সামান্য কিছু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তকে বাদ দিলে—হয়ে দাঁড়াচ্ছে আজ স্পষ্টতই, এক ধরণের অমানবিকতার পাঠশালা। যে পাঠক্রমের priority বলতেও মূলত দুটি একটি উপাচার, যাতে সাড়া দেবার জন্য মানুষের পক্ষে খুব বেশি মানুষ হবার কোনো দরকারই পড়ে না!

প্রাচীন এথেন্সের একটা লোকশ্রুতি : জন্মের সময় দেশকে যে অবস্থায় পেয়েছো, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার বেলায় দেখো তাকেই যেন আর একটু ঐশ্বর্যমণ্ডিত রেখে যেতে পারো তুমি।

ফলত, এটাই হলো নাগরিকতার কষ্টিপাথর। অথচ মুস্কিলটা হলো এই যে দেশ ও বিশ্বের বর্তমান যা হাল হকিকৎ, এই গোছের কোনো উক্তি, প্রবচন ইত্যাদিও সেখানে যেন তেমন কোন প্রাসঙ্গিকতাই দাবী করতে পারে না। এমনই একটা অবস্থা বৈগুণ্যে পড়ে গেছে আজকের দুনিয়া। প্রতিটি নাগরিকের কৃতি সুকৃতির পরম্পরা ধরেই গড়ে ওঠে জন্মভূমির জীবন। ধনে মানে গৌরবে সংযোগে সমৃদ্ধ এক স্বদেশী সমাজ। এটাই মনে হয় প্রাচীন এথেনীয় ঐ লোক-শ্রুতির অন্তিম অভিমুখ। যা নিয়ে কোনো আবেশ, কোন মাথা ব্যথাই যেন নেই আজকের সিনেমার। কি এদেশে, কি ও সব দেশে। এর তুলনা একমাত্র আফিং এর সাথে। সেদিন চোখে পড়লো স্টেটসম্যানের কোন একটি সম্পাদকীয় লেখায়—'The ethic of the Bombay commercial film industry is the ethic of the tranquiliser—it is the new opium of the masses.' (The Statesman, Jan 22, 1996

শুধু 'Bombay'র জায়গায় ওখানে অন্য যে কোন দেশের কথাও ভেবে নিতে পারি আমরা, যেখানে সিনেমাকে পণ্যই ভাবা হয় এবং মুনাফার বিবেচনাটাই সব চেয়ে বড় বিবেচনা বলে মান্য করা হয়। প্রশ্ন হলো এই আফিং হয়ে ওঠা, বাণিজ্যিক এই হঠকারিতাই কি অবশ্যম্ভাবী ছিল সিনেমার জায়গায়? এই সূত্রেই এসে পড়ে একটু পেছনের কথা, ইতিহাসের কথা।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫। ফরাসী দেশের দুই নাগরিক, রক্তসূত্রেও পরস্পর ভাই, অগুস্ত আর লুই লুমেয়ের। এদেরই উদ্যোগে পারির এক সালোঁতে (salon) অনুষ্ঠিত হলো—এই ভ্রাতৃদ্বয়েরই উদ্ভাবনী প্রতিভার ফসল 'বায়োস্কোপ' নামক বিস্ময়কর সেই বস্তুটির প্রথম প্রদর্শন। বিকাশের ঐ

আদিম স্তরে আসলে যা ছিল এক মিনিট দেড় মিনিট দৈর্ঘ্যের চলন্ত কিছু ফটোগ্রাফিক ইমেজ মাত্র। অথচ সামান্য এক কি দেড় দশক যেতে না যেতেই উন্নতির কোন শিখরই না ছুঁয়ে গেল তা। হলিউডের ডি. ডব্লু. গ্রিফিথ। ছবি করলেন 'একটি জাতির জন্ম' বা 'দা বার্থ অব আ নেশন' (১৯১৫)। আর এক নিরিখে যা একটা নতুন শিল্পেরও 'জন্মকথা'। ভবিষ্যতে যে সব পদ্ধতি প্রকরণ, শৈলী ও আঙ্গিকের সুবাদে চলচ্চিত্র নামক চমকপ্রদ ঐ আবিষ্কারটি একটা শিল্পের কোঠায় উত্তীর্ণ হবে, সে সমস্ত কিছুরই প্রায় সর্বাত্মক একটা প্রয়োগ ঘটান গ্রিফিথ স্বরচিত এই ছবিতে। স্বীকৃত হয়ে যান নিজেও বিশ্ব চলচ্চিত্রের আদি পিতা হিসেবে। প্রসঙ্গত একটি উক্তি, যার উৎস এডুইন পোর্টার। ইনিও হলিউডের, যাঁর তৈরী একটি ছবি—'লাইফ অব্ অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান' (১৯০৩) চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে ছবির জন্যেও বিশেষ একটা স্থান নির্ণীত হয়ে আছে। সম্পাদনা বা film editing সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রথম ফলিত দৃষ্টান্ত হিসাবে। সেই এডুইন পোর্টারেরই একটি কথা। মোটামুটি বাঙলায় যার বয়ানটা দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম —

চিত্তবিনোদন কি শিক্ষাপ্রদান, এই দুটি কাজের থেকেও অনেক বেশি কিছু করতে সক্ষম আজকের সিনেমা। চলতি যুগের যে সব দাবী, চাহিদা, আশা আকাঙ্ক্ষা, শুধু সেগুলির খোরাক যুগিয়ে যাওয়া নয়। ভাবী প্রজন্মকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও আজ করায়ত্ত সিনেমার। সমকালীন মঞ্চে সেরা সেরা অভিনয়ানুষ্ঠান দেখা যায়। সিনেমাও সেগুলো চিত্রায়িত করে রাখতে পারে। আর পাশাপাশি পারে, সমকালীন ইতিহাসকেও ধরে রাখতে। চাই কি নতুন করে তাকে রূপায়িত করতে। এই যেমন মেক্সিকোর বিদ্রোহ। সিনেমায় যাকে এমন ভাবেই দৃশ্যায়িত করা সম্ভব, যা শুধু মুখের কথায় বা সাহিত্যের কলমে মোটেই সম্ভব নয়। এমনই যাথার্থ আর বাস্তবিকতার সঙ্গে ঘটনাকে চিত্রায়িত করতে পারে সিনেমা। মূল ইংরাজির কিছুটা অংশ :

'...it will chronicle and reproduce history as no other medium even could or possibly will. As an illustration, the present Mexican Conflict, through the motion picture, can be exhibited to future generations with such realism and exactitude as the spoken or written word could never convey.'

এডুইন পোর্টার এ মন্তব্য করেন, নিজের লেখা সংক্ষিপ্ত একটি রচনায়। সময়টা ছিল ১৯১৬। তার মানে 'বার্থ অব আ নেশন' হয়ে গেছে। এবং এইসব ঘটনারই বছর দশেক পরের কথা। তৈরী হলো আর একটি ছবি। 'যুদ্ধ জাহাজ পোটেমকিন' (দ্য ব্যাটলশিপ পোটেমকিন. ১৯২৫)। সোভিয়েটের ছবি, সের্গেই আইজেনস্টাইন নামের সাতাশ আঠাশ বছরের এক যুবকই যার রচয়িতা। তখনও ছবি সবাক হয় নি। রঙীন হওয়া তো দূর কা কথা। কিন্তু বলে আবেদনে, বৈভবে মৌলিকতায়, সিনেমা নামক নবীন এই মাধ্যমটির পক্ষে এমনই অমোঘ, দুর্মর একটা অভিজ্ঞতা হয়ে এলো যার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। ইতোমধ্যে চ্যাপলিনের আবির্ভাব ঘটে গেছে। বাণিজ্যিক সাফল্যের নিশ্চিত গ্যারাণ্টির পাশাপাশি হলিউডের এইসব দিক্‌পাল চলচ্চিত্র-কারদের দৌলতেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে বিশ্বসিনেমা। গল্প বলার কত না অভিনব ধরণ, সিনেমা আঙ্গিকের কত না বিস্ময়কর প্রয়োগ, প্রবর্তন! আর এ সব সত্ত্বেও সোভিয়েটের সিনেমা—আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন, দোবশেঙ্কো, ঝিগা ভার্তভ্—সারা বিশ্বের চোখের সামনেই খুলে দিল নতুন একটা সম্ভাবনার এলাকা। হলিউডের ভূমিকা নিশ্চয় বিরাট। কিন্তু সেখানে একটা উদ্বেগের ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে সর্বদা। সে হলো মুনাফা। এবং একই সঙ্গে মুনাফা ভিত্তিক মার্কিনি জীবনাদর্শের সীমা। স্বীয় প্রতিভার দৌলতে, ঐতিহাসিক নানা কার্যকরণের সন্নিপাতে ব্যতিক্রম যাঁরা হলেন তো হলেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে? থেকেই গেল কিন্তু ঐ দুটি বাধ্যবাধকতার ভূমিকা, হলিউডের সিনেমায়। তথা পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই। আর সেইখানেই স্পষ্ট হয়ে গেল সেদিনের সোভিয়েট সিনেমার অনন্যতা। যে বিষয়ে পরে মন্তব্য করবেন য়রিস্ ইভেন্স। তথ্যচিত্রের জগতের স্বীকৃত এই ডাচ্ পরিচালকটির মুখেই শুনবো আমরা—রাশিয়াই হলো পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের নবতীর্থ। A new Mecca for experimental Cinema, অনেকটা এই রকমই ছিল তার বক্তব্যের নির্যাস।

এবং সে experiment এর মূলে accentটা কিসের ওপর? মানুষ, জগত, জীবন। এই সমস্ত মিলিয়ে বিচিত্র, বিপুল এই যে বাস্তবতা—সিনেমাকে হয়ে উঠতে হবে এরই এক অপ্রতিরোধ্য রস রূপায়ন। আত্মস্থ করে নিতে হবে, পূর্বকালীন সমস্ত শিল্পের যাবতীয় যা শিক্ষা। এবং মানুষের কাছেই পৌঁছে

দিতে হবে, এমন এক শৈল্পিক অভিজ্ঞতার স্বাদ—যা মানুষ হিসাবেও তাকে অনেকটা সমুন্নত করবে। অনুপ্রাণিত করবে জীবনকে জানতে, বুঝতে এবং বদলাতেও।

ইতোমধ্যে শব্দ আসে (১৯২৯)। নির্বাক ছবি সবাক হয়। জন ফোর্ড, রেনে ক্লেয়ার, জাঁ রেনয়া, আলফ্রেড হিচকক্। ওসব দেশের সিনেমায় শোনা যায়, দিক্পাল এইরকম এক একজন পরিচালকের কথা। বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ইটালির ভিত্তোরিও ডি সিকা। স্বপরিচালিত 'বাইসাইক্ল থীভ্স, (১৯৪৮) ছবিটির মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দেন সম্ভাবনার আর এক দিগন্ত। উঠে আসে আর একটি নাম, জাপানের আকিরা কুরশওয়া। বিশ্ব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে, অসামান্য একটি কাজ—'রশোমন' (১৯৫০)। ক্রমে শোনা যায় আরো একগুচ্ছ প্রতিভাশালী চিত্র পরিচালকের কথা। লুই বুনুয়েল, বার্গম্যান, ফেলিনি, ডেভিড লীন, আন্তোনিয়নি, ত্রুফো, গোদার, ওয়াইদা, ইয়াঙ্ক শো, কিস্লোস্কি, তারকোভস্কি থেকে শুরু করে ইয়ালমাজ গুনে, টমাস অ্যালিয়া, ওসমান সামবেন, বেন বারকা, সোলানাস এমনি বিশিষ্ট এক একজন রচয়িতা। যাঁদের অবদানেই এতটা অগ্রগতি আধুনিক সিনেমার। শুধু আঙ্গিক, প্রযুক্তিতে নয়। বাস্তবের আরো নব নব অভিব্যক্তির মানদণ্ডেও অনেকটা।

শতবর্ষের এই প্রেক্ষাপটে এইসব সাফল্যের কথা নিশ্চয় স্মরণ করতে হবে। বাণিজ্যিক প্রবণতা সিনেমার শুরু থেকেই ছিল। তার মধ্যে থেকেও কাজ করে গেছেন এঁরা। প্রেরণা নিয়েছেন সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত থেকে। যাকে বলা যেতে পারে আজ সারা বিশ্ব চলচ্চিত্রেরই উত্তরাধিকার। যে বিশ্ব চলচ্চিত্রের মানচিত্রে আমরাও খোদাই করে নিয়েছি আমাদের নাম—'পথের পাঁচালী' (১৯৫৬) ও সত্যজিৎ রায়। আরো রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, প্রমুখের মত সব পরিচালক। ও তাঁদের তৈরী নানা স্বাদের, তাৎপর্যের এক একটি কাজ। রয়েছেন এদেরই যত তরুণ ও সাম্প্রতিক সব উত্তরসূরীরা।

শতাব্দীর সালতামামি সূত্রে বিস্তীর্ণ এই মানচিত্রের সমস্ত উচ্চাবচতার দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হবে। কত ধারার (genre) ছবি হয়েছে, কোন কোন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বড় বড় এক একটা বাঁক নিয়েছে বিশ্ব সিনেমা, আঙ্গিকের এক একটি উন্মোচন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কি ভাবে সমস্ত সিনেমার ব্যাকরণকেই মুহূর্তে উন্নীত করে দিয়েছে অভূতপূর্ব কোনো নতুন

সীমানায়—এ সবই আজ এনে ফেলতে হবে পুংখানুপুংখ পর্যালোচনার সীমানায়।

খুব কঠিন হয়ে উঠছে আজ সিনেমার কাজ। রুঢ় থেকে আরো রুঢ় হয়ে উঠছে, ক্রমশ, লগ্নী আর উশুলের লৌহ লজিক। চেষ্টা চলছে সিনেমাকে এমন এক ধরণের মানসিক প্রশিক্ষণের হাতিয়ার বানিয়ে তোলার দিকে যা মানুষকে একেবারেই বাস্তবের ক্রীড়নক করে দেয়। মানুষই যে রচয়িতা, সব কিছুর নিয়ন্তা নিয়ামক—এই প্রত্যয়ের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

এর ভিতর দিয়েই এগোতে হবে বিশ্ব সিনেমাকে তার আকাঙ্খিত মানবমুখিনতার লক্ষ্যে। আগামী শতাব্দীর চলচ্চিত্র, বিশ্বকে দেবে কি আবারও আর একজন গ্রিফিথ কি আইজেনষ্টাইন, রেনয়া কি বুনুয়েল কিংবা ঋত্বিক কি সত্যজিৎ রায়কে?

মানুষের সব স্বপ্নই তো ভবিষ্যতকে নিয়ে। □

বইমেলায় মজুষ দাশগুপ্তর নতুন বই

ডুমুর গাছে হাওয়ার ঘুঙুর—২০ টাকা

আলোক শূন্যতা—৫ টাকা

নির্বাচিত কাব্য নাটক—৪০ টাকা

●

সমর্পণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই

ফিরে আসি কোলাহলে

কবিতা সীমান্ত প্রকাশনী

বাঙলা ছবির এই সময়

বিপ্লবকুমার ঘোষ

বাঙলা ছবির বাজার ভাল কি মন্দ তা বিচার করবেন দর্শকরা। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছবি বাদ দিলে ১৯৯৬ সালে ভাল বাঙলা ছবি প্রায় নেই। রিলিজ করেছে যত ছবি তার বেশির ভাগই চলেনি। অর্থাৎ দর্শকদের টানতে পারেনি। প্রযোজকরা দিতে পারেন নি নতুন সৃষ্টি ও সুষমা। পাশাপাশি হিন্দি সিনেমা চলছে রমরম করে। বাজেট তাদের কোটি টাকা ছাড়ালেও লাভের অঙ্ক তারও দ্বিগুণ। অর্থাৎ দর্শকদের মনোরঞ্জন এখন সবটাই সেই সব প্রযোজকদের হাতে।

তবে প্রশ্ন, কেন বাঙলা ছবির এই দুর্দিন? বাঙলা ছবির এই দুর্দশা দেখে অনেকেই চুলচেরা বিচার করতে বসেছেন। ময়না তদন্তও হয়েছে। অথচ গোড়াতেই গলদ সেটা কারও নজরে পড়ছে না। ভাল গল্প নেই, গান নেই, সুদক্ষ পরিচালনার অভাব। প্রযোজক তাঁর টাকার গরমে বাঙলা ছবিতে ঢোকাচ্ছেন নিজের সব আজগুবি পরিকল্পনা। ফল তাই হাতে হাতেই মিলছে।

এখন দূরে-দর্শনে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন চ্যানেলে নানা অনুষ্ঠান। প্রায় সবটাই হিন্দি বা ইংরেজিতে। বড় পর্দাকে হার মানায় ছোট পর্দার এই সব অনুষ্ঠান। একটা প্রতিযোগিতাও বলা যেতে পারে। নতুন নতুন প্রতিভা জাগছে নিত্য নতুন। বাঙলা ছবির সেই পরিচিত কয়েকটি মুখের প্যান-প্যানে অভিনয় আর ভাল লাগবার কথা নয় দর্শকদের। নতুন প্রতিভাও জাগছে না প্রযোজকদের অনিচ্ছায়। বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্প আজ তাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। সনাতনী ঐতিহ্য আজ বিপদের শেষ লগ্নে করুণ সুরে বাজছে। জোয়ার শেষে যেমন ভাঁটা আসে। একসময়ে বাঙলা ছবিকে অনুসরণ করত সবাই। এখন হয়েছে ঠিক তার উল্টো। নিজেদের ভাণ্ডারে কিছুই আর অবশিষ্ট না থাকলে যা হয়।

আমরা যদি বেশ কয়েক দশক পেছনে যাই, তবে দেখতে পাব, পৌরানিক

কাহিনী নিয়ে ছবি ভারতের সব ভাষাতেই হত। বাঙলায় যত পৌরানিক ছবি হয়েছে সে সময়, তখন ধর্ম নিয়ে মাতামাতি কম হত। বিশেষ করে অন্য ভাষার তুলনায়। হয়ত রেনেসাঁর ফল। পাশাপাশি নাটক ও যাত্রা বাঙলায় জনপ্রিয় ছিল এবং এদের কাহিনী দিত বাঙলা ছায়াছবি। অভিনয়ে থাকত পাকা নাটকাভিনয়ের ছাপ। আবার অনেক সময় অনেক ছবির কাহিনীর উৎস ছিল বাঙলা উপন্যাস বা ছোট গল্প। সবাক যুগে বাঙলা সাহিত্যের প্রভাব শুধু বাঙলায় নয়, অন্যান্য প্রদেশের ছবিতেও পাওয়া যায়।

আমরা দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বাঙলা উত্তাল হয়েছে। কিন্তু আমোদ-প্রমোদে কোনও ভাঁটা পড়ত না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, চলচ্চিত্র যখন শিল্প হিসেবে মর্যাদা পায়নি আমাদের দেশে, তখনই কত সুন্দর সুন্দর ছবি উপহার পেয়েছি আমরা। তার প্রকাশ ভঙ্গি, উপস্থাপনা যেন এখনকার শতাব্দীকেও হার মানায়।

আমরা এই মুহূর্তে হাতের কাছে সব কিছু পেয়েও যেন পিছিয়ে যাচ্ছি অন্ধকারের দিকে। যেখানে রুচি নেই, বোধ শক্তির বালাই নেই।

পুরনো চাল অবশ্য ভাতে বাড়ে। নতুন প্রযোজকরা কেন যে সেই শিক্ষা নিচ্ছেন না তা বুঝতে পারছি না। অথচ ১৯৩১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র মুন্নিবাই-এর গান গাওয়ার দৃশ্য ছবি তুলে দেখানো হয়েছিল ক্রাউন হলে। কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা সে সময় মানুষের মনে। উৎসাহ মানুষকে জাগাতে হয়। এখনকার প্রযোজকরা তা জানেন না। বা মানবার চেষ্টাও করেন না।

বাঙলা ভাষার প্রথম সবাক কাহিনী চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী' যার পরিচালক ছিলেন অমর চৌধুরী, ১৯৩১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তা রিলিজ করেছিল। এই সবাক বাঙলা ছবির বাজার দেখে তার পরবর্তী দু'বছরে তৈরি হয়েছিল পরপর ১৪টি বাঙলা ছবি।

আসলে এক সময় যে সব গুণী লোকদের সমাবেশ ঘটেছিল বাঙলা ছবিতে তা এখন আর নেই। দু'একজন যা আছেন তাঁদের পরে আর কেউ উঠে আসছেন না। আজ থেকেও প্রায় ৫০ বছর আগে নিউ থিয়েটার্সে অনেক গুণী লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তার মধ্যে কমেডিয়ান ডি জি, পরিচালক দেবকী বসু, অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এবং আরও কয়েকজন। দেবকী বসুর

সঙ্গীতের রসবোধ ছিল। তিনি দুজন বৈষ্ণব সন্ত কবির জীবন নিয়ে ছবি করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ছবি দুটি 'চণ্ডীদাস' ও 'বিদ্যাপতি' গানের জন্য আকর্ষণীয় হয়। ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করে ছবির যে নতুন চেহারা নেয়, দেবকী বসু তা দেখালেন 'বিদ্যাপতি'তে।

ওই সময়ে জনপ্রিয় ছিলেন অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। আসামের গৌরীপুর রাজ্যের রাজার ছেলে বলে তিনি 'প্রিন্স' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ইউরোপে ফরাসি পরিচালক রেনে ক্লেয়ার ও জার্মান পরিচালক আর্নেস্ট লুবিশের সঙ্গে কাজ করেন। দেশে ফেরেন শব্দ ও আলোর কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এবং এন. টি. স্টুডিওতে যোগদান করেন। দেবকী বসু যেমন পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতেন, বড়ুয়ার আকর্ষণ ছিল সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি। যে ছবি তাঁকে সারা ভারতে অসামান্য জনপ্রিয়তা দেয়, সেটি হল 'দেবদাস'। ছবিটি বিখ্যাত উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসের চিত্রায়ণ। ছবিটি হিন্দি ও বাঙলা ভাষায় করা হয়েছিল। ছবির কাহিনী এক ব্যর্থ প্রেমিকের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কাহিনী। তার প্রেমিকার বিয়ে হয়েছিল এক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে। অনেকের মতে 'দেবদাস' ছবিতে রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে পরিচালক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানোর চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন নায়কের বিষাদঘন জীবনকে দেখাতে। এর কারণও ছিল। বাঙালি দর্শকরা সাধারণত ভাবপ্রবন হওয়ার ফলে বিয়োগান্ত গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে আকৃষ্ট হতেন এবং বিরহে কাতর, আত্মপীড়ায় ক্লিষ্ট নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতেন।

১৯৪৮ সালে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সিনেমার ওপর একটি প্রবন্ধ লেখেন—

'In India it would seem that the Fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood of-en by a queer process of reasoning movement was equated with action and action with melodrama.'

এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন "what the Indian Cinema needs to day is not more gloss, but more imagination, more integrity and a more intelligent appreciati-n of the

l imirations of tbe medium·· what our cinema needs above everything else is a style, an idiom, a short of iconography of cinema, which would be uniquely and recognisably Indian" এর সাত বছর পরে সত্যজিৎ নিজেই Unique y Indian ছবিটি করে ভারতীয় ও বিশ্বের চলচ্চিত্রের দরবারে উপহার দিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় কয়েকজন চলচ্চিত্র প্রেমী ও বুদ্ধিজীবী যুবক, যাঁরা মনে করতেন চলচ্চিত্র একটি শিল্প মাধ্যম, যাঁরা চলচ্চিত্রে জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন তার বাস্তবতার মধ্যে, যাঁরা ভাবতেন ও স্বপ্ন দেখতেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্যে একটি অন্য পথের, তাঁরা উন্নত মানের বিদেশী ছবি দেখবার বাসনায় গড়লেন কালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সেটা ১৯৪৭ সাল। ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল এভাবেই। এই যুবকদলে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নিমাই ঘোষ, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও আরও অনেকে। পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন। এই আন্দোলনের ফসল হিসেবে আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি অগণিত চলচ্চিত্র প্রেমী দর্শক, কয়েকজন চলচ্চিত্রের সমঝদার, সমালোচক এবং কয়েকজন প্রতিভাবান পরিচালক ও কলাকুশলী।

অনেক ইতিহাস পেরিয়ে আজ বাঙলা ছবি কোনঠাসা, মৃতপ্রায়। কারণ কিছু ব্যবসায়ী প্রযোজক এখন বাঙলা ছবিকে রূপান্তরিত করতে চাইছেন তাঁদের মজার ও উপভোগের সস্তা বস্তুতে। শিল্প ও ঐতিহ্য নিপাত যাক। পঞ্চাশ বছর আগে ১৩৫০-এ ছিল আকাল, খাবার আকাল, কিন্তু মনের ফসল ভরা ছিল থরে থরে। আর আজ ? আজও আমরা এক আকালের সামনে।

আমরা জানি, বাঙলা ছবিকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। কিন্তু কি ভাবে ? সেই মন্ত্রণা তদ্দণ্ডই হোক নতুন করে। নতুন সৃষ্টির সন্ধানে। □

একুশ শতাব্দী

ঠিক সময়ে পেতে হলে

গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়

প্রসঙ্গ ঃ বইমেলা

অমলেন্দু ঘোষ

পড়ুয়া মাত্রেই জানেন, বইয়ের টান কিংবা বইয়ের প্রতি আগ্রহ বা মমত্ব ও ভালবাসা মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিক ঘটনা। তা সে বই ছাত্রপাঠ্য বা গবেষণাপাঠ্য হোক অথবা পণ্ডিতপাঠ্য বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনীয় কোনো বই বা সর্বজনপাঠ্য গল্প-উপন্যাস-ও কবিতা-রম্যরচনা বা দৃশ্যকাব্য-নাটকের-বই যাই হোক না কেন। শিক্ষিত মানুষের আত্মচেতনা বা গভীরতর বোধ / বোধি ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে বইপত্রের এক অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে—যেমন রয়েছে সৈনিকের জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিয়মিত অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বইপত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে.যে কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। বইপড়া ও বইপড়ার সুযোগ পাঠকের কাছে সীমাহীন আনন্দের উৎস স্বরূপ—পাঠকের মানসিক গঠন প্রকৃতির পক্ষে তা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞার সাক্ষাত পাওয়া যাবে বইয়ের পাতায় পাতায়। কোনো পাঠকই তার দেশের বা বিদেশের সমস্ত বইই পড়ে ফেলতে পারে না। এমনকি তা দেখাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কোনো পাঠক যত বেশি সংখ্যক বই পড়তে পাবে তত বেশি তার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। যারা তা পড়তে পারে না, তাদের চিন্তাভাবনার এমনকি বলা-কওয়ারও তেমন কিছু থাকে না। জড়পদার্থরূপী বই এখানে মহাশক্তির একটি আণবিক / পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি শক্তিশালী—একখানি বই নীরবে একটি মহাবিপ্লব ঘটাতে পারে। আমাদের দেশে একখানি রামায়ণ-মহাভারত যেমন কোটি-কোটি শিক্ষিত অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে সমর্থ, তেমন আজকের দুনিয়ায় সমাজ-সচেতন লক্ষ-লক্ষ শিক্ষিত পাঠকের মনেও মার্কস-এর 'ডাস ক্যাপিটাল' (Das Capital) উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পেরেছে। বইয়ের

ক্ষমতার বিচারে এই দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

পাঠকের হাতে বই আসে গ্রন্থাগার অর্থাৎ গ্রন্থাগার কর্মীর মারফত। গ্রন্থাগার হলো একাধারে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকরী মাধ্যম এবং উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও অন্যতম সক্রিয় বাহন স্বরূপ। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পাঠক তথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তার আত্মচেতনার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার বইয়ের সাহায্য নিতে পারে, আবার স্বাধীন চিন্তার সঠিক প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের বিচারও করতে পারে অনায়াসে। পাঠক তার সঠিক চিন্তার ও বিচারের পথ বেছে নিতে পারে। পাঠক নিজেই তার চালক ও শিক্ষকের ভূমিকা নিতে পারে। গ্রন্থাগার তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তিধর ও কার্যকরী এক চালিকাশক্তি, একাধারে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক রাজনৈতিক ও জ্ঞানবিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যক্তিগত প্রজ্ঞার চরম বিকাশক্ষেত্র কিংবা ল্যাবোরেটরির মতোই পরীক্ষাগার স্বরূপ। এবং এইজন্যই গ্রন্থাগারকে নানাভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে সদ্যসাক্ষর, স্বল্প-শিক্ষিত ও তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে যেসব শিক্ষিতরা তাদের মন-মতি, চোখ-কান বন্ধ করে রেখেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠার দিক থেকে।

বইয়ের প্রদর্শনী বা বইমেলা এক্ষেত্রে তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে—লেখক পাঠক তথা চিন্তাশীলদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে পারে। বিশেষত যখন বই ছাড়া অন্যভাবে লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের যোগসূত্র রচনার অন্য কোনো সক্রিয় মাধ্যম এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। বইয়ের প্রদর্শনী বা বইমেলা তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠক তথা পাঠকের পাঠস্পৃহা বা বইপড়ার আগ্রহকে উত্তরোত্তর আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। বই এখানে নিতে পারে একটা সক্রিয় এবং অগ্রণী ভূমিকা।

এই ভাবে বইমেলা একটা পাঠকগোষ্ঠী তথা সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারে—যেখানে চিন্তাজগতের সেরা প্রতিনিধি তথা লেখকরা প্রায়ই মিলিত হতে পারে, ভাবের আদান-প্রদান হতে পারে। এখান থেকে সমাজের মস্তিষ্ক চালনাকারীরা লাভবান ও সমৃদ্ধ হতে পারে। এখানে থাকবে সম্পূর্ণ ও অবাধ স্বাধীনতা, যেহেতু বইপত্র কোনো জাতি-ধর্ম ও বর্ণের বাধা বা সীমা মানে না। এখানে সবারই থাকবে বইপত্র দেখা ও নাড়াচাড়া করার স্বাধীনতা, যাতে প্রয়োজন-মতো বইপত্র আলোচনা করে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ জ্ঞানার্জনে আরো বেশি

করে বইপত্রের সাহায্য নিতে পারে। মেলায় প্রদর্শিত বইপত্র থেকে পাঠক যাতে জ্ঞানরাজ্যের অতীত বর্তমান সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা গড়ে তুলতে পারে, বইমেলা কর্তৃপক্ষ সেদিকে জাগ্রত দৃষ্টি রাখবে।

বইমেলার উদ্দেশ্য হবে—সঠিক বই সঠিক পাঠকের গোচরে আনা ; প্রদর্শিত বইপত্র হবে বহুবিচিত্র বিষয়ের, যাতে বিচিত্রবিদ্যার অনুরাগী পাঠকরা তাদের নিজ নিজ রুচি ও পছন্দমতো খোরাক পায় হাতের কাছে ; মেলা থেকেই যাতে সাধ্যমতো বইপত্র পাঠক কিনতে পারে, বা প্রকাশনা সংস্থায় চিঠি লিখে ভিপি-যোগে পরে সংগ্রহ করতে পারে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বিদেশের বইপত্র রাখারও ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বইপত্রের পরিবেশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা কোনো দেশের সংকীর্ণ গণ্ডি / সীমা / বাধা মানে না ; জ্ঞান-বিজ্ঞান দুনিয়ার সব মানুষের জন্যেই সবার নাগালের মধ্যেই এনে দিতে হবে। তাই বইমেলাকে প্রকৃতপক্ষে বলা যায় আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র—যেখানে মানুষের চিন্তাভাবনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রচনাকর্ম ইত্যাদি এক জায়গায় এসে মিলতে পারে—একটা উদার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সবার দিকে সাদর আহ্বানের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। বইমেলা তাই মানে না কোনো দেশ-কাল-পাত্রের বা জাতি-ধর্ম-বর্ণের গণ্ডি।
করে তোলে। বইমেলা একাধারে বইপ্রেমী, বইসন্ধানী ও ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের সমানভাবে ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। এই শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বইমেলা তাই সঠিক ও সক্রিয় গাইডের কাজ করে থাকে।

দুনিয়ায় বইমেলা তথা বইপত্রই প্রকৃত সাম্যবাদী ; বইমেলা তথা সংগৃহীত বইপত্রই পাঠকদের সকলের সামনেই সমভাবে খোলা রত্নাগার বিশেষ ; এখানকার রত্ন অর্থাৎ জ্ঞানের আধার স্বরূপ বইপত্রের কখনো ক্ষয় বা বিনাশ নেই ; এবং এই জ্ঞানই যেকোনো পাঠক মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেমতো সংগ্রহ করতে পারে। কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বাধা দিতেও পারবে না। এই সাম্যের রাজ্যে বাস করতে, এই ধনরত্ন / মণিমাণিক্য অধিকার করতে ও ব্যবহার করতে কেউ বাধা দিতে পারে না ; এই ধনরত্নে আনন্দসুখ থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। এই মহামূল্যবান ধনরত্ন / মণিমাণিক্য ঐশ্বর্য সম্পদ সংগ্রহ করতে বেশি কিছু লাগে না, লাগে একমাত্র বইপত্রের প্রতি আন্তরিক টান, অর্থাৎ ইচ্ছে /আগ্রহ আর ভালোবাসা—বৃহত্তর অর্থে বইমেলার প্রতি তীর্থযাত্রীর মতো আন্তরিক আকুলতাপূর্ণ মুগ্ধ ভালোবাসা। □

ফুলগুলি সব গেল কোথায়

কিশলয় সেন

তেষট্টি থেকে ছিয়ানব্বই—বছরের ফারাক তেত্রিশ। কিন্তু আমাদের এপার বাঙলার জীবনে তফাৎটা বিস্তর। ষাটের দশককে আমরা দেখেছি উত্তাল সময়ের কাল হিসেবে। ছিয়ানব্বইয়ের সঙ্গে তার মিল খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এ কয় বছরে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। পিট সিগারের চোখে এই অমিলটা কি ধরা পড়েছিল? তাঁর গানের ভাষাতেই যদি প্রশ্নটা তোলা যায়—'হোয়ার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন?···ওহ! হোয়েন উইল ইউ এভার লার্ন?' আমরা শিখবো। শিখছি। নতুন করে শিখে চলেছি।

তেষট্টিতে—সেদিন পিট সিগারের সম্বর্ধনার আয়োজক ছিলেন কলকাতার কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কর্মীরা। এবারে—ছিয়ানব্বইয়ে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। ১৭ নভেম্বর '৯৬ নজরুল মঞ্চে বসেছিল সম্বর্ধনার আসর। হাজির ছিলেন সুবেশ সুভদ্র কলকাতাবাসী। এদিনের সন্ধ্যায় কিছু গান পাগল অনামন্ত্রিত যুবক প্রবেশ অধিকারের দাবী জানিয়ে সোরগোল বাধিয়ে তালভঙ্গের সমস্যা করেছিল বটে, কিন্তু ঘটনাটা বেশিদূর গড়ায়নি। সুভদ্র কলকাতাবাসীর সৌভাগ্য বলা যায়। এরপরও পিট সিগারের যে ক'টি অনুষ্ঠান হয়েছে—সব ক'টিই সীমিত পরিসরে, চার দেওয়ালের ঘেরা টোপের মধ্যেই। তাঁর সেই সব অনুষ্ঠান শোনার দুর্লভ সৌভাগ্য কত সংখ্যক মানুষের হয়েছে আমাদের জানা নেই।

'উই শ্যাল ওভারকাম, সামডে'—কোনদিন আমরা জয় করবোই। পিট সিগার বিশ্বের নানা দেশ ঘুরে বারবার এই প্রত্যয় ঘোষণা করে যান। কোন বাধার প্রাচীর উলঙ্ঘনের কথা শোনাচ্ছেন তিনি? কাদের ডেকে বলছেন? আমরা জানি এরা কারা। যারা আজও শোষণ যন্ত্রণা, নিত্য বঞ্চনা, অমানবিক প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায়, বেদনায় অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই করে চলেছেন—পিট সিগারের গান তাঁদের কাছে আজও মন্ত্রের মত।

পিট সিগারের গান শুনলেই আমার মনে পড়ে এদেশেরই চারণ—মুকুন্দ দাসের কথা। সেই দেশপ্রেম মানবপ্রীতির পথ ধরেই সৃষ্টি হয়েছে গণসংগীতের ঐতিহ্য। আমরা পেয়েছি—নজরুল, সুকান্ত, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীকে। এঁদের সৃজন প্রতিভায় রচিত হয়েছে এদেশের গণসংগীতের ভিত্তিভূমি। আমরা ওমর শেখের গান শুনেছি. কলকাতা ট্রাম শ্রমিকের গান শুনেছি, সলিল চৌধুরীর স্কোয়াডের গান শুনেছি। সময়ের দাবী তাঁদের সৃজন প্রতিভাকে উজ্জীবিত করেছিল। আমরা লড়াইয়ে প্রেরণা পেয়েছিলাম। সে সব আজ শুধুই ইতিহাস

তেষট্টির অপরাহ্নে পল রোবসনের গান কণ্ঠে নিয়ে যে মিছিল কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল পিট সিগারকে সাদর সম্ভাষণে—তাঁরা ছিলেন ওই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ের সাথীরা। সে এক প্রাণবন্যা। সজীব মানুষের প্রাণবন্ত প্রকাশের স্বাক্ষর।

সেদিন বিকেলে পিট সিগার গানে গানে পাগল করে দিয়েছিলেন পার্ক সার্কাস ময়দান-ভরা মানুষকে। গাইতে গাইতে নেমে এসেছিলেন মানুষের মাঝে। সারা ময়দান তখন গলা মিলিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

সেদিনের সেই বিকেলে হাজির ছিলেন কারা? ছিলেন কলকারখানা অফিস আদালতের শ্রমিক-কর্মচারী নিম্নবিত্ত মানুষ! ছিলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কমিউনিস্ট বামপন্থী সংস্কৃতি কর্মীরা। পিট সিগার যে নিছকই একজন সংগীত শিল্পী নন, তিনি বেদনার্ত, অবমানিত, অপমানিত ব্রাত্যজনের অন্তরের আবেগ অনুভূতিকে কতটা নাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেন সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেদিন। তাঁর অ্যাবিলিটি, শোম্যানশিপ, কণ্ঠ মাধুর্য, পারফরমেন্সের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভই পিট সিগারকে চেনায় না। আরও কিছু আছে যে কারণে তিনি মনের দুয়ারে ঘা দিয়ে যেতে পারেন।

সংবাদ পাঠে জানলাম—একালের জনৈক সংগীতশিল্পী পিট সিগারের পারফরমেন্স দক্ষতায় অভিভূত। কেবল কলাকৌশলের সিদ্ধিলাভেই পিট সিগারের উচ্চতালাভ দুরাশামাত্র। যে পথ ধরে পিট সিগাররা এগিয়ে যান সে পথ বন্ধুর, বিপদ আকীর্ণ। সে পথে বাণিজ্যিক সাফল্যে সোনালী হাতছানি নেই।

সুতরাং এই 'আরও কিছু'টা হল শোষিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি পিট

সিগারের দায়বদ্ধতা, অপরিসীম বিশ্বাস, গভীর ভালবাসা। পিট সিগার গানের ভাষায় প্রশ্ন তোলেন—'হুইচ সাইড ইউ আর অন।' এই দায়বদ্ধতার কারণেই ম্যাকার্থি জমানায় পিট সিগারকে কাটাতে হয়েছে মার্কিন কারাগারে। এই দায়বদ্ধতার তাগিদেই আজও এই একাত্তর বছরের যুবক দেশে দেশে ছুটে বেড়ান—নিউ ইয়র্কের কার্নেগী হল থেকে পূর্ব বার্লিনের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্গীত সম্মেলন পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গী হয় নিপীড়িত আফ্রিকার লোকসঙ্গীত যন্ত্র ব্যাঞ্জো। এই পণ্য সর্বস্ব, ভোগবাদে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়ার সর্বগ্রাসী প্রচারের যুগে যেখানে মাইকেল জ্যাকসনরা দাপিয়ে বেড়ায় সেখানে পিট সিগার এক জীবন্ত প্রতিবাদ। যৌবনের দীপ্ত প্রকাশ তাঁর সর্ব অঙ্গে। যেটা আবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এবারও। পিট সিগারের গান আজও তাই জীবন সঙ্গীত। যে জীবন সঙ্গীত আমরা খুঁজে পাই—পল রোবসন, যোয়ান বেজ, বেলা ফন্ট, উডি গাথ্রে, বব ডিলান, ইউরি-সালনটিয়েভ, হুলিও ইগলেসিয়াসের গানে। আমাদের বেদনা, হতাশার মুহূর্তে জীবনকে ভালবাসার স্বপ্ন দেখায়।

কলকাতা প্রতিদিন তার রঙ বদলায়। পাল্টে পাল্টে নতুন নতুন চেহারায় নতুন মাত্রা পায়। পরিবর্তনই জীবনের লক্ষণ এটা মানতেই হয়। ষাটের দশকের সঙ্গে আজকের ছবি মেলে না। সেটাই স্বাভাবিক। যুগ পাল্টেছে। নতুন নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি ঘটেছে। সেকালে লড়াই ছিল মুখোমুখি। প্রত্যহ। অবিরাম। আজ শত্রুকে কয়েক পা পেছু হটাতে পারা গেছে। ছবিটাও পাল্টেছে। এখন রণক্ষেত্র সীমিত পরিসর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। লড়াকু মানুষের শিবির অনেক সংহত, ব্যাপ্ত—এ হিসেবে কোন ভুল নেই। এরই বিপরীতে যে ছবি তাতে কেমন একটা ঢিলেঢালা চালচলন, আত্মতৃপ্তি, অসতর্কতার ছাপ। এ প্রজন্মের এ্যাফ্লুয়েন্ট সমাজের যুবক-যুবতীর রুচি দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। তাদের প্রভাব অন্য স্তরেও সঞ্চারিত হচ্ছে না এমন উদাসীন মনভঙ্গী আত্মবিলোপের পথ প্রশস্ত করে। এরা আগামীদিনে কোথায় পৌঁছবে তার আগাম নির্দেশ কে করবে? জ্যাকসন ম্যাডোনাদের সম্মোহনে তারা ভেসে যাবে, নাকি রোবসন, পিট সিগারদের গান গলায় নিয়ে শেকল ভাঙার লড়াই চালিয়ে যাবে সে কথা আগামী ইতিহাসই বলবে। তবু আমরা আশাবাদী।

এত কিছুর মধ্যেও কলকাতার ঐতিহ্য, অতীত ইতিহাসকে আমরা অস্বীকার

করতে পারি না। সে প্রাণ স্পন্দন এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সময়ের চাহিদা তরুণ-তরুণীদের উদ্বেল করে। অথচ অগণিত যুবক-যুবতী পিট সিগারের গান শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এ সত্যটা অস্বীকার করি কেমন করে!

হয়তো পিট সিগারকে তাঁর প্রিয় মানুষদের সামনে উপস্থিত করতে একটা ব্রিগেড মাঠ যথেষ্ট নয়। কিন্তু 'যুব-ভারতী' বা 'নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম'-এ আয়োজন করলে কি একটা বড় সংখ্যার মানুষের আশাকে তৃপ্ত করা যেত না? অথচ আমরা জানি 'হোপ ছিয়াশি' 'নব আনন্দে জাগো,' কুমার শানু বা মিঠুন চক্রবর্তীর অনুষ্ঠানগুলি এসব জায়গায়ই করা গেছে।

যুব ছাত্র সংগঠনগুলি পিট সিগারের সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন বাঙলা একাডেমী সভাগৃহে। সেখানে স্থান ছিল উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের তুলনায় অপ্রতুল। অনুষ্ঠানে যোগদানে বঞ্চিতদের ক্ষোভ কি অসঙ্গত, অপ্রাসঙ্গিক? প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ সংগঠকরাও যে কি করে এমনটি করতে পারলেন ভাবতে অবাক লাগে। একটা দায়সারা ভাব কি প্রকাশ পেল না? আমাদের বক্তব্যে বিরক্তি এবং উষ্মার সঞ্চার করতে পারে, তাতে সত্যটা পাল্টে যাবে? এসব প্রশ্ন অনেকেই করছেন। কিন্তু উত্তর দেবার মানসিকতা কোথায়? সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার যাঁরা চান তাঁরাও নিরুত্তর। অন্ততঃ একটা চলনসই গোছের উত্তর তাঁরা দিয়েছেন কিনা জানা নেই।

এখানে একটা কথা উঠতে পারে—যাঁরা অর্থাৎ যাঁদের স্পনসরশিপে পিট সিগারের কলকাতা আগমন সম্ভব হয়েছে তাঁরা হয়ত 'বিশেষ কারণে' কোন খোলামেলা পরিবেশে পিট সিগারকে ছাড়তে চাননি। এটা স্পনসরশিপের রুগ। অতএব তাঁদের কথাই মান্য। কিন্তু আমরা যে আশাহত এবং অতৃপ্ত রইলাম সেটাও বাস্তব সত্য। ক্ষোভটা থেকেই যাবে। তাই ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলতে হচ্ছে কলকাতার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি মর্যাদা দেখানো হয়নি। পিট সিগার দীর্ঘজীবী হোন! □

● গল্প

কার্যকলাপ

মৃদুলকান্তি দে

একটা নতুন জিনিস কিনেছি। দেখবি তোরা? সন্দীপ বলল।

হ্যাঁ, দেখব। ব্রত সায়ন অর্ণব একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

ওরা চারজন একসঙ্গে স্কুলে যায়। বুধো মণ্ডলের রিক্সা চড়ে। স্কুল অনেকদূর, যেতে প্রায় একঘন্টা। অর্ণব ক্লাশ ওয়ানে পড়ে। ব্রত সায়ন আর সন্দীপ ক্লাশ টু-তে। বছর ছয়-সাত বছরের চারজন শিশু রিক্সায় যেতে যেতে সারাটা পথ হৈ হৈ করবে। চলন্ত রিক্সা থেকে কখনো হাত বাড়িয়ে গাছের পাতা টেনে ছেঁড়ে। কখনো বুধো মণ্ডলকে জিগ্যেস করে: কাকু, তুমি সাত টাকার নোট দেখেছ?

স্কুল যাবার সময় সন্দীপ আর ব্রত বসেছে রিক্সার গদিমোড়া সিটটাতে। ঠিক উল্টোদিকে ছোট কাঠের একটি বেঞ্চ রয়েছে, সেখানে বসেছে অর্ণব আর সায়ন। স্কুল থেকে ফেরার সময় অর্ণব আয় সায়ন ওপরের সিটে বসবে। কাঠের বেঞ্চে সেসময় ব্রত আর সন্দীপ বসবে।

বইয়ের ব্যাগ খুলে সন্দীপ পেন্সিলের বাক্স বের করলো। তার বাক্সটা দেখতে ঠিক সেই যন্ত্রের মত যেটা ট্রাফিক সার্জেন্টদের হাতে প্রায়ই দেখা যায়। সন্দীপ ওটা কানের কাছে রেখে দিব্যি বলল, ক্র্যাকডাউন হয়েছে? তোমরা তাড়াতাড়ি বাঙ্কারে চলে এসো। হ্যাঁ, যাদের ধরেছ, ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে যাও। এক্ষুনি।

ব্রত বলল, সন্দীপ, এটা কী?

ওয়াকিটকি। সন্দীপ বলল।

ওয়াকিটকি? সেটা কি? অর্ণব জিজ্ঞেস করল।

ওয়াকিটকির মাধ্যমে খবর পাঠানো যায়। কাশ্মীরে পুলিশ মিলিটারি সবার হাতে ওয়াকিটকি থাকে, জানিস ? সন্দীপ বলল।

তুই কী করে জানিস ? সায়ন বলল

এবার গরমের ছুটিতে বাবা মা'র সঙ্গে সন্দীপ দিল্লি গিয়েছিল মামার বাড়ি। সেখানে সে অনেক গল্প শুনেছে, কিছুদিন হলো, সন্দীপের মামা চাকরিসূত্রে কাশ্মীর থেকে দিল্লি চলে এসেছেন। মামার ছেলে হামপি, বয়স বারো বছর. সন্দীপকে বলেছিল, এ কে ফর্টি সেভেন রাইফেল দেখেছিস কখনো ? আমি দেখেছি। বলেই সে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গি করেছিল, মুখে শব্দ করেছিল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে অদৃশ্য এক জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছিল। সন্দীপ বেশ মজা পেয়েছিল। কুড়ি দিন ছিলো সন্দীপ মামার বাড়ি। প্রতিদিন হামপির সঙ্গে যখন-তখন জঙ্গি-পুলিশ লড়াই করেছিল।

সন্দীপকে ঘিরে কৌতূহল সবার। সন্দীপ ওয়াকিটকি-কাম-পেন্সিলের বাক্সটা আবার কানের কাছে তুলে খবর পাঠালো : রিমোট কন্ট্রোল এক্স-রে ইউনিটকে এখনই রওয়ানা হতে বলো।

ব্রত বলল, তুই তখন থেকে কী বলে যাচ্ছিস। ক্র্যাকডাউন, বাঙ্কার।

সায়ন বলল, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে. এক ঢোক জল খাই। বলেই সে জলের ফ্লাস্ক খুলে জল খেল। হলো কি, ফ্লাস্কের ঢাকনাটা হাত ফস্কে পড়ে গেল রাস্তায়। সায়ন চেঁচাল, কাকু কাকু, রিক্সা থামাও। চারজন শিশু সমস্বরে হৈ চৈ করতেই বুধো মণ্ডল রিক্সা থামায়। সায়ন লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। সন্দীপ বলল, সাবধানে যা। ক্রস-ফায়ার দেখলেই শুয়ে পড়বি।

সায়ন কথাটার কী মানে বুঝল, কে জানে ! তবে ব্রত আর অর্ণব মিটমিট করে হাসল। আজ রিক্সায় উঠেই সন্দীপ কী সব বলছে। নতুন কথাগুলোর এক বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না। সায়ন ঢাকনাটা নিয়ে রিক্সার কাছে আসতেই সন্দীপ ঝট্ করে নেমে পড়ল রাস্তায়। সে সায়নের সারা শরীরে হাতের পেন্সিল-বাক্সটা বুলিয়ে দিচ্ছে।

বুধো মণ্ডল অবাক হয়ে তাকালো।—এই সন্দীপ, কী হচ্ছে ?

সন্দীপ বলল, মেটাল ডিটেকটর দিয়ে দেখছি, কোন অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা !

বুধো মণ্ডল রীতিমত রেগে যায়—মামার বাড়ি ঘুরে এসে তোর কী হল রে সন্দীপ ? মাথা বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে !

বুধো মণ্ডল রিক্সা চালাচ্ছে আর গজগজ করছে। বুধো মণ্ডল আজ আবার রোদ আড়াল করবার জন্য টুপি পরেছে।

হামপির সঙ্গে কুড়ি দিন যুদ্ধ খেলাটা খুব মজা আর উত্তেজনার ছিলো। চার বছর কাশ্মীরে থেকে হামপি কত কিছু জেনে গেছে। একদিন হামপি করল কি, বিছানার সব বালিশ পরপর সাজিয়ে বাঙ্কার তৈরি করেছিল। যেন বালির বস্তার বাঙ্কার। বাঙ্কারের আড়াল থেকে খেলনা বন্দুকে সতর্ক চোখ রেখে সন্দীপকে শিখিয়ে দিয়েছিল, কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়।

আর একদিন হামপি করেছিল কি, মিছিমিছি হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধেছিল বেশ পুরু করে। ব্যান্ডেজের ভিতরে একটি খেলনা পিস্তল লুকনো ছিল। ব্যান্ডেজ-বাধা হাতটি ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল গলার সঙ্গে। তারপর সন্দীপকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সামনে পার্কটির চারপাশ ঘুরে ওরা বাড়ি ফিরল। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে যখন হাঁটছিল, একটি পুলিশের গাড়ি দেখতে পেয়েই হামপি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সন্দীপ লক্ষ করেছিল হামপির চোখমুখে কী ভয়! অচেনা একজন বয়স্ক লোক জিজ্ঞেস করেছিল, খোকা, হাত ভাঙল কী করে? হামপি সটাসট উত্তর দিয়েছিল, লাফ দিয়ে চেক-পোস্ট পেরনোর সময় পড়ে গিয়েছিলাম।

আজ সন্দীপ নতুন ভাষায় কত-কি গল্প করছে। ব্রত সায়ন অর্ণব শুনেও মজা পাচ্ছে বেশ। পাহাড় জঙ্গলে যুদ্ধের জন্য যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের কাউকে ওরা দেখেনি। একটা কৌতূহল থেকে শিশুমনের প্রশ্ন আর উত্তর জানার ব্যস্ততা সবার মধ্যে। বাবা বলেছে, এবার পুজোয় আমাকে রকেট-লঞ্চার কিনে দেবে। সন্দীপ নির্বিকারভাবে বলল।

ব্রত বলল, সত্যিকারের?

সন্দীপ রেগে যায়।—নয়ত কি খেলনা?

সায়ন বলল, তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিবি?

সন্দীপ আবার রেগে যায়।—দূর বোকা! কারুর বাড়িতে পাউরুটি কাটার ছুরি থাকলে সে পড়াশোনা করবে না?

ব্রত বলল, হামপির আছে?

সন্দীপ বলল, হামপি এবার হারপুন মিসাইল কিনবে।

অর্ণব বলল, সত্যিকারের বন্দুক দেখলেই পুলিশ তোকে ধরবে।

সন্দীপ আবার রেগে গেলো।—অর্ণব, তুই ক্লাস ওয়ানে পড়িস। আগে

ক্লাশ টুতে ওঠ, তারপর তোর বুদ্ধি হবে! পুলিশকে বন্দুক দেখাবো কেন? পুলিশকে আমি কমলালেবুর কোয়া দেখাব।

তখনই পাশ দিয়ে সাঁ করে সবুজ রঙের একটি গাড়ি ছুটে গেলো। ওয়াকিটকির মত দেখতে পেন্সিল-বাক্সটা সন্দীপ কানের কাছে তুলে তক্ষুনি খবর পাঠালো : হ্যালো, অপারেশন আর্মি! একটা সবুজ রঙের গাড়ি গেলো এইমাত্র। সন্দেহ হচ্ছে, গাড়িটির ভেতর বিস্ফোরক আছে। টাইম ডিভাইসেস ডিটেকটর নিয়ে এখনই গাড়িটিকে আটকাও। হ্যাঁ, আমি কাকুকেও নির্দেশ দিচ্ছি, রিক্সা আরো জোরে চালাতে। কান থেকে সন্দীপ পেন্সিল-বাক্সটা নামিয়ে নিয়ে বুধো মণ্ডলকে বলল, কাকু জোরে চালাও। সবুজ গাড়িটি চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাচ্চারা সন্দীপের কথার সুরে রৈ রৈ করে উঠল। যেন এক বাক্স মজাকে ওরা সন্দেশের টুকরোর মতো ভাগ করে আনন্দ করছে। পৃথিবীকে এগারো হাজারবার ধ্বংস করবার মত অস্ত্রভাণ্ডার পৃথিবীর বুকেই মজুত আছে—এই তথ্য বাচ্চারা জানলেও একোরিয়ামের সামনে দাঁড়ালে ওরা মাছ দেখে খুব খুশি হবে, জানা কথা। বুধো মণ্ডল বাচ্চাদের কাণ্ড দেখে বলে উঠল, মস্ত গুলের মত চোখ করে কী দেখছ, কাকু?

বুধো মণ্ডল বলল, হ্যাঁরে সন্দীপ, মামার বাড়ি কটা দিল্লি কা লাড্ডু খেয়েছিস?

ওরা পৌঁছে গেলো! স্কুল গেটের সামনে রিক্সা দাঁড়াতেই ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ল চারজন। বাচ্চারা বলল, কাকু, টাটা। বইয়ের ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে চার-জন শিশু স্কুলে ঢুকে পড়ে। স্কুল ছুটি হবে বিকেল তিনটের সময়। এই দীর্ঘ সময় বুধো মণ্ডল স্কুল গেট থেকে একটু দূরে রিক্সা দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করবে। চায়ের দোকানে বসবে। গল্প-গুজব করবে। টিফিনের কৌটো খুলে ভাত খাবে। প্রায় ন'মাস হলো, চারজন খোকাকে নিয়ে সে ইস্কুলে আসছে। ছুটির পর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে, প্লাস্টিকের ছাউনি দিয়ে চারদিকটা ঢেকে একটু জল লাগতে দেবে না গায়।

ফটাস। বুধো মণ্ডলের রিক্সার চাকা ফেটে গেলো। সামনের চাকাটাই ফেটেছে। ফেরার পথে। সন্দীপ রিক্সা থেকে নেমে বলল, ওই সবুজ গাড়িটার কাণ্ড হবে। ওরা রাস্তার নীচে মাইন পুঁতে রেখেছিল।

তোরা বসে আছিস কেন ? নাম। বুধো মণ্ডল তাড়া দিল। ওরা নামল। সারাদিন ক্লাশ করে ক্লান্ত সবাই।

সায়ন বলল, তুই যে বললি মাইন। মাইন কী রে সন্দীপ ?

চুপ। মুখের সামনে তর্জনী তুলে সন্দীপ বলল, এক্ষুনি ব্ল্যাক কম্যাণ্ডো এসে পড়বে।

রাস্তার অনেক জায়গায় পাথর সরে গিয়ে এবড়ো খেবড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে ; কপালের ঘাম মুছল বুধো। লিক সারাই করতে বেশ কিছু খরচ হবে। কাছাকাছি একটা রিপেয়ারিং-এর দোকান আছে। রিক্সাটাকে ওই অব্দি টেনে নিয়ে যেতে হবে বাচ্চারা পিছন থেকে রিক্সাটাকে ঠেলতে শুরু করে। বুধো মণ্ডল যতই বলছে, এ্যাই তোরা ছেড়ে দে। কেউ শুনছে না। বরং উৎসাহ পেয়ে আরো শক্তি প্রয়োগ করছে বাচ্চারা।

রাস্তার বাঁদিকে তো রিপেয়ারিং-এর দোকান ; ডানদিকে মাঠ। সেই মাঠে নেমে পড়ল চারজন। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো নারকোল গাছগুলোর চারদিকে বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। রিপেয়ারিং-এর দোকানে একটা টুলের ওপর বসে আছে বুধো মণ্ডল। রিক্সার টায়ার সারাই হচ্ছে।

সন্দীপ দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে রিক্সার কাছে এলো। বইয়ের ব্যাগ খুলল। একটা আপেল আর একটা মৌসম্বি বের করল ব্যাগ থেকে। তারপর বুধো মণ্ডলকে রীতিমত অপ্রস্তুত করে মাথার টুপিটা কেড়ে নিয়ে আবার ছুটল।

ব্রত, এদিকে আয়। তাড়াতাড়ি। সন্দীপ ডাকল। ব্রতর হাতে আপেলটা তুলে দিয়ে সন্দীপ বলল, এটা গ্রেনেড।

গ্রেনেড ? ব্রত সবিস্ময়ে তাকালো।

হ্যাঁ। গ্রেনেড যার গায়ে ছুঁড়ে মারবি, সে মরে যাবে। সন্দীপ বলল নির্লিপ্ত গলায়।

কাকে ছুঁড়ব ? ব্রত অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল। নতুন খেলার অজানা দিকটা কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়। সায়ন অর্ণব সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সকাল থেকে সন্দীপ নতুন ভাষায় কত কী বলছে : ক্ল্যাকডাউন, বাঙ্কার, ব্ল্যাক কম্যাণ্ডো, হারপুন মিসাইল।

তুই ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়া। ব্রতকে বলল সন্দীপ।—এখন

আমরা সুড়ঙ্গ পথ দখল করবার জন্য লড়াই করব। আমি যখন চার্জ বলব, তখনই ছুড়বি।

এবার সন্দীপ সায়নকে বলল, ওই যে পাথরটা দেখছিস ওটা নিয়ে আয় তো। ওটা তোর গ্রেনেড।

—আর আমার? অর্ণব সন্দীপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তোর গ্রেনেড ছুঁড়ে কাজ নেই। তুই এখনো বাচ্চা। ক্লাস ওয়ানে পড়িস। ঠিকমত ছুঁড়তে না জানলে হাতেই ফেটে যাবে। সন্দীপ গড়গড় করে বলল।

—তুই বরং আমাদের কাজ দ্যাখ। বড় হলে তোকে আমরা নেবো।

অর্ণব কী বুঝল, কে জানে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

বিকেলবেলার রোদ নারকোল গাছের পাতায় এসে আটকে গেছে। গাছের মগডালে একটা ঘুড়ি থেকে অল্প একটু সুতো ঝুলছে। সন্দীপের মাথায় বুধো মণ্ডলের সেই টুপিটা। সন্দীপ বলে, টুপি নয় জঙ্গলযুদ্ধের হ্যালমেট। সন্দীপের ডান হাতে মৌসাম্বি। সন্দীপ বলে, মৌসাম্বি নয়, ওটা গ্রেনেড। তিনজন তিনটে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা বিষন্ন অর্ণব দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সে ক্লাস ওয়ানে পড়ে, সে ছোট। এই অজুহাত দেখিয়ে ক্লাস টু-র সন্দীপ ব্রত সায়ন ওকে নতুন খেলায় নিচ্ছেই না।

একটা পাখি এসে বসেছে মাঠে।

—চার্জ।

সন্দীপ চেঁচাতেই তিনটে গোলাকার বস্তু তীব্র গতিতে ছুটে গেলো। সায়নের ছোঁড়া ঢিলটা গিয়ে লাগল পাখিটার গায়। পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে, ছটফট করছে। কিছুতেই উড়তে পারছে না। ওরা ছুটে হাঁটু মুড়ে গিয়ে বসল পাখিটার কাছে। অর্ণব উল্টোদিকে ছুটল। সে রিক্সা থেকে জলের ক্লাস্ক নিয়ে এলো।

সন্দীপ, আমি জল এনেছি। অর্ণব বলল।

ওরা জল খাওয়াল পাখিটাকে। আহত পাখিটা ঝিম মেরে আছে। চারজন শিশু পাখিটাকে ঘিরে।

ঠিক এরকম একটা পাখি দিঘিতে দেখেছিলাম। সন্দীপ বলল।

পাখিটা কী সুন্দর! মরে যাবে না তো? সায়ন বলল।

গ্রেনেড গায়ে লাগলে মরে যায়। ব্রত বলল।

ধুর। আমরা কি সত্যিকারের গ্রেনেড ছুঁড়েছি? সন্দীপ বলল।

স্থির পাখিটা একটু নড়ে উঠল না ? গোল হয়ে বসা চারটি শিশু মাথা নামিয়ে পাখিটাকে দেখছে। সন্দীপ টুপিটা উল্টো করে মাটিতে রাখল। রেখে বলল, পাখিটাকে তুলে বসিয়ে দিই এখানে। ওরা তাই করল। আলতো করে পাখিটাকে মাটি থেকে তুলে এনে টুপির ভিতরে খুব যত্ন করে রাখল। চোখ ঘোরাচ্ছে পাখিটা। যেন কিছু বলতে চাইছে চারজন শিশুকে। ঠিক তখনই বুধো হাঁক পাড়ল, চলে আয়। রিক্সা ঠিক হয়ে গেছে।

ব্রতর হাতে টুপি। টুপির ভিতর আহত পাখি। পাখির ঠোঁটের কাছে প্লাস্কের ঢাকনা। ঢাকনায় অল্প জল। চারজন শিশু পাখিটাকে ঘিরে হাঁটছে। নিষ্পলক চোখে পাখিটাকে দেখছে সবাই। আবার পাখা নাড়ল পাখিটা।

পাখিটার প্রাণ আছে। উৎকণ্ঠ চারজন শিশুর মনে আশা : পাখিটা ঠিক বাঁচবে কারণ, সত্যিকারের গ্রেনেড তো ছোঁড়া হয়নি। □

প্রকাশিত হলো
ছোটদের অঙ্কন শিক্ষার বই

চারুশিক্ষা

সম্পাদনা—সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

●

প্রভঞ্জন হালদারের প্রথম
কবিতার বই

শব্দে আছি নৈঃশব্দের মোহে

জীবিকা সংবাদ ও অন্যান্য

উৎপলেন্দু মণ্ডল

আমি জয়ন্ত। পৃথিবীতে কিছু জিতে নেব বলে আসি নি। বরং হয়তো হারাতে এসেছি। একজন মানুষ জীবৎকালে কত কিছুই তো হারায়—এই যেমন আমার বন্ধু তৃণাঞ্জন, ইন্দ্রনীল, আরও অনেকে সবার নাম করা যাবে না—তাহলে বন্ধুপ্রীতি নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ এরা আমার বন্ধু। ভাল বন্ধু। অনেক সুখের দুঃখের বাতাস আমরা প্রাণভরে ভাগাভাগি করে নিতাম। এক নারীর নিতম্বে হাত দিয়ে আমরা যৌন আনন্দ খুঁজতাম। সিগারেটের তামাক বার করে তাতে গাঁজা ভরে আমরা একসঙ্গে টানতাম। এখন ওরা জয়দেবের কেঁদুলির মেলায়, অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার উৎসব, কতকিছুতে যায় ওরা দলবেঁধে বারাকপুর, চাকদা, টাকির নবাবগঞ্জের সড়কে গল্প পড়তে যায়। সুবর্ণকঙ্কন পরা নারীদের সঙ্গে প্রেম করে—ওরা আমাকে ডাকে না। আমাকে কেউ ডাকে নি, আমাকে কেউ নিয়ে যায় নি জয়দেবের মেলায় কেউ নিয়ে যায় নি অযোধ্য পাহাড়ে। আমি এভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছিলাম। হ্যা আপনারা যাকে বলেন ডি-ক্লাসড। একে বাঙলায় কি বলব ? বাস্তুচ্যুত, স্থানচ্যুত, মহাবিশ্বের বিগব্যাং, কিংবা···থাক ঐ শব্দবন্ধটি আপনাদের হাতে থাক।

আমি হঠাৎই একটা স্কুল মাস্টারী পেয়ে চলে গেলাম আমতায়। কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু যানবাহনের প্রতিকূলতায় অনেকটা সময় খেয়ে নিত। না আমতা জায়গাটা কিন্তু খুব খারাপ নয়। বেশ গ্রাম্য শহর। পাশেই কানা দামোদর। বর্ষার সময় কানা দামোদর নৌকায় করে পেরিয়েছি। অসংখ্য শৈবালদাম তাকে বেঁধে রেখেছে। হয়তো আমার জীবনের মতো। আমার বন্ধু তৃণ, ইন্দ্ররা যেমন আমাকে ডাকে না···ওরা কতো সহজে পেরিয়ে যায় বাঙলাদেশ। মানিক আবার পাসপোর্ট করেছে আমেরিকায় যাবে বলে—। ইন্দ্র ওকে নিয়ে উপন্যাস লিখছে—নিমাই'র আমেরিকা যাত্রা। আমার গায়ে পুলক লাগে। ওরা জয়দেবের মেলায় যায়, বনগাঁয় গল্প পড়তে যায়—শতাব্দী শেষের শেষ সূর্যাস্ত দেখে গঙ্গার পাড়ে, আমাকে কেউ ভুলেও ডাকে না। তৃণ

খুব ভাল রান্না করে—ইন্দ্র, তৃণ, মানিক ওরা নিজেরা, এবং ওদের নিজস্ব নারীদের নিয়ে চড়ুই ভাতি করে আমি তখন পাশের গার্লস স্কুলের বড় দিদিমনির ছত্রছায়ায় বসে থাকি। কানা দামোদরের পাড়ে তখন অগনন শস্য ফলনের হাসি। চাষী মেয়েরা শীতের কুয়াশা সরিয়ে ঝাঁকা ভর্তি ফুলকপি, বাঁধাকপি, শস্য নিয়ে বাজারে আসে। নদী পাড়ের প্রথম আলোয় সেই দৃশ্য আমাকে পুনর্জন্ম দেয়। পীতাম্বরের নরেশ বাবু আমার সঙ্গী। আর পাঁচ বছর চাকরী। ছেলে বউ এখানে থাকে না। গড়িয়ায় বাড়ি করেছেন। ছেলেদের অসুবিধা হবে বলে মা ছেলেদের কাছে থাকে। নরেশ বাবু একা। বিশাল ভাড়া বাড়িতে তিনি একা। মাঝে মাঝে প্রাক্তন ছাত্রদের দিয়ে আমাকে ডাক পাঠান আমার মেসে। আসলে নরেশ বাবু আমাদের দেশের লোক। দুজনেই খুলনার। আমি তার ছেলের মতো, তবু আমার সঙ্গে সব কথা হয়। কানা দামোদরের মেয়েদের দিকে তাকাতে বারণ করে। দেশীয় ভাষায় আমাকে অসৎ বলে গালাগালি করে। আমার খুব কৌতুক লাগে। এই সাতসকালে মেসের গুলতানি ছেড়ে এখানে—বেশ লাগছে।

কোর্টের মাঠে এখনও শিশির মেশানো ঘাস। সামনে থানা। পিছনে কোর্টের পুকুর। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে পোস্ট অফিস। গায়ে নূতন রঙের মিষ্টি গন্ধ। এই পোস্ট অফিস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বন্ধুদের চিঠিপত্র আসে মেসবাড়ির বারান্দায়। ঘোষাল দা মেসবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। আমতা পীতাম্বরের বিজ্ঞানের মাস্টার। কিছু হলেই ছাত্র আছে ভদ্রভাবে কথা বল এইসব বলে আমাদের সংযত করে রাখে। আমতা সারা পাড়ায় ছাত্র। ব্যাচেলার লোক, মেস বাড়িটাই তার সব। সবার সঙ্গেই তার ভাব ভালবাসা। প্রায় তিরিশ বছরের মেস বাড়ির কত বোর্ডার এসেছে আবার চলে গেছে—কত বছর আগের হিসেবের খাতায় তাদের নাম ধাম সব লেখা—। এইসব পৃষ্ঠা ওল্টালে কি রকম পুরনো কালের গন্ধ। আমার খুব ভাল লাগে—। আমি এসবে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ আমি এভাবে ডি-ক্লাসড্ হয়ে যাচ্ছিলাম। হয়তো এটাই ধ্রুপদী পরিবর্তন। জীবন তো অনেক বড়ো। অনেক পর্যবেক্ষণ অনেক মাপজোখ; অনেক ভালবাসা, অনেক সূর্যাস্তের শোকগাথায় মুখর আমাদের এই ধার করা জীবন। তবু কেন যে আমাদের ভাল লাগে এসব। এগুলো কি জীবনের এলিমেন্টারী ফেনো মেনন। জানি না আমি এসব কিছুই জানি না। তবু আমি এখানে পড়ে আছি। ভালবাসায় স্থিত হতে চাইছি

কিন্তু পারছি কই। কোন কোন শনিবারে বন্ধুদের দেখা পাই। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করি। বাতাসে চৈত্রের আবহ। ঠিক এরকম বিকেলে ইন্দ্র আমাকে বনানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার স্কুলের দিকে নাকি বাড়ি, মহিলা আবার কবিতা লেখেন। একটা কবিতার কাগজও নাকি করেন। আমার খুব বেশী উৎসাহ নেই। আমি কবিতা লিখি না। কোনদিন আমার উৎসাহ নেই কবিতায়। ইন্দ্র, তৃণ এরা কবিতা লেখে কিন্তু গল্প ফিচারই আমার মুখ্য অবলম্বন। ওরা গ্রাম নিয়ে লেখে না। ওরা পুরোদস্তুর নাগরিক। নাগরিক জীবনের অনিয়ন্ত্রিত বিবর্তন ওদের লেখার বিষয়। আমি পারি না। আমি শহরকে চিনি না। ওদের পর্যবেক্ষণ, ব্যাপ্তি, স্থানিকতা—আমাকে ঈর্ষান্বিত করে আগামী বছরগুলোতে বাঙলা সাহিত্যের অনেকগুলো পৃষ্ঠা ওরাই দখল করে রাখবে। ওদের সেই শক্তি আছে। বুদ্ধির ক্রমাঙ্ক ছুঁয়ে আছে ওদের হাতের কব্জিতে। এখন চারপাশে উদারনীতির অগ্রগতিতে বিশ্বাসী মানুষজন। ওরা এগিয়ে যাবেই। আমি আগ্রহী হই। পরিস্থিতির দিকে খর নজর রাখি। আমি সান্ত্বনা পুরস্কার পাই। আমার বন্ধুরা বাংলা সাহিত্যের মেইনস্ট্রিমে লিখছে।

আমি ঠিক এই রকম সময়ের আমতা রোডের পাশে জলের দামে কিছু জমি কিনলাম। পাশ দিয়ে গেছে জল বাহিত নালা। উলুবেড়ের মিষ্টি জল মানিকপীর, দশ নম্বর এর খাল দিয়ে এসব জমিতে আসে। গরমের সময় ভাল চাষ হয়। এসময় হাত পাওয়া যায় না। জিগ্যেস করলেই বলে বীজতলায় কাজ করছিলাম। সরকারী খালের মাটি কেটে ভিটেমাটি উঁচু করলাম। আহাঃ কি সুন্দর মাটি। একটু চাপ দিলেই গুঁড়ো হয়ে যায়। আমি নরেশবাবুকে দেখাই। নরেশবাবু আমার উপর রেগে যান। ভায়া তুমি এখানে সেটেলড্ হলে। এখানে সব এদেশিয় লোক। দেখ না আমাদের দেখলে কি রকম বাঙাল, বাঙাল, বলে গালাগালি করে। হ্যাঁ সে আমি জানি। প্রতিদিন একবার করে স্কুলে শুনতে হয়—বাঙাল মনুষ্য···।

তবু আমি যেন এখানকার প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলাম। এখানকার বাতাসের সজীবতা,সব্জির ক্লোরোফিলময় সবুজ বিহ্বলতা আমাকে শেকড় গাড়তে সাহায্য করছে। হ্যাঁ যার কথা বলছিলাম, বনানী কবিতা লেখে, আমার মেসে এসে দেখিয়ে যায়। বি. ডি. ও অফিসের জয়দেব দাশ, সান্ত্বা এরা আমাকে ক্ষেপায়, বনানী আমাকে তুক করেছে। আমি মজা পাই। আমাকে নিয়ে মেসে বেশ

মজা করে— অনেকে মজা পায়। আমি এখানকার মাটি আর মানুষে এক হয়ে যাচ্ছি। এই ভাবে আমরা একক বিশ্বে নিজেদের সভ্য করছি। নরেশবাবুর বক্তব্য তুমি এখানে সেটেলড হচ্ছ কেন। তুমি এখানে কোন আত্মীয় বন্ধু পাবে না। নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে।

আমি নরেশবাবুর সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি আমরা এখনও পরিযায়ী পাখি। কালিন্দীর ওপার থেকে মাইগ্রেটেড হতে হতে রায়মঙ্গলের এপারে এসেছিল বাপঠাকুর্দারা। আমি আবার এখানে এই কানা দামোদরের দেশে। এখানে বনানী, তার শস্য ফলনের হাসি, উলুবেড়ের মিষ্টি জল, আর মিঠেন ধুলো মাটি আমাকে টানছে।

আমি জীবনে খুব বেশি তো চাই নি। জীবনে পিছনে লাইফ সেভিং টিউব রাখিনি। একটাই তো জীবন। সুতরাং খুব বেশি বেঁধে বেঁধে কাজ করতে আর চাই না। এভাবেই যতদূর যাওয়া যায়। সেদিন বনানী এসেছিল হাতে কয়েকটা কবিতা। মেয়েটার হাত খারাপ নয়। কয়েকটা লাইন আমার বেশ ভাল লাগে—

অভিমান গাঢ় হয় জীবনের শুষ্ক পাপাচারে
এ কি জীবন না জীবনের সমূহ কলরব !

সেই বঙ্কিমের কথা। এ জীবন লইয়া কি করিব। আসলে প্রত্যেক মানুষের মনে বোধহয় সংশয়। স্মৃতির রোগপাণ্ডুর বার্তা এ ভাবেই কি আমাদের ভিতরে ভিতরে ক্ষয়িত করে ! বাপঠাকুর্দার দেশ ছেড়ে এখানে—। আমার বাড়ি কমপ্লিট। বাঁশের চটা দিয়ে মাটি গেঁথে এক অনবদ্য নির্মাণ। উপরে টালির চাল। বেশ বড় বারান্দা। মাঝে মাঝে আমি আর নরেশবাবু বারান্দায় এসে বসে থাকি। চারপাশে গরমের ধান। সবুজ প্রান্তর ঘেরা অনবদ্য সুখ অভিমান। একটু দূরে মজা হাজা সরস্বতী। বাসে করে ঘন্টাখানেক এগিয়ে গেলে— ডিহিভরশুট। বাদশা আকবরের আমলে এখানকার তাঁতীদের কাছ থেকে তাঁতবস্ত্র রপ্তানি হত। দূরে বিকেলের আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে ধানক্ষেতে। বাতাসে সরস গন্ধমালা। সেই নদী, সেই মানুষজন সব মরে হেজে গেছে। দেশ ভাগ হয়েছে। এখনও গঙ্গার পাড়ে ভাঙন। ডি. ভি. সি. জল ছাড়লে এসব অঞ্চল প্লাবিত হয়। পরে পলিসমৃদ্ধ হয়ে এই জমি আবার দ্বিগুণ ফসল দেয়।

নরেশবাবুকে বলছিলাম, কোথায় আপনার অবাক কলকাতা। দেখুন তো কি সুন্দর এই গ্রাম বাংলা। পলিটিক্যাল ছুঁচোর কেত্তন বাদ দিলে গ্রাম তো

এখনও সুন্দর। দেখুন গঙ্গা, ভাগীরথী, সরস্বতীর একই স্রোতধারায় এসে আমরা কি রকম মিলেছি। এখানে ভাইরাস, বীজাণু, ব্যাকটেরিয়া আপনাকে প্রতি পদে এসে বিরক্ত করছে না। প্রাণ নিয়ে অতো মাথাব্যথা নেই। দেখুন সাধারণ মানুষগুলো কি রকম সদানন্দ হয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। আর আপনি শুধু ভাবছেন ছেলে বউর কথা, আপনার নির্মীয়মান বাড়ির কথা। জীবন অনেক বড়। আসুন এখানে আমরা দুজন কাটিয়ে দিই।

নরেশবাবু এবার মুখ খুললেন। সেদিন প্রাতঃ ভ্রমণে বেরনোর সময়ে এক ছাত্রের বাবা, তিনি নাকি আবার স্থানীয় কমরেড তিনি ঐ সাত সকালেই নাকি সম্বোধন করেছেন কি মাস্টার ষাট না প'য়ষট্টি। নরেশবাবু দর্শনার্থী হয়ে অভয় দেন ষাট। বালাই ষাট। আমি এসবে দামে যাই না। এই প্রত্যন্ত গ্রাম আমার ভাল লেগেছে। এখানেই আমি স্থানীয় বাসিন্দা হব। আমার এখানকার স্বরাষ্ট্র সচিব, হেডস্যার আমাকে অভয় দিয়েছেন—। তিনি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আমায় সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

মাঝে মাঝে কলকাতায় যাই। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। কফি হাউসে পেজ-এডিটর আলো করে বসে থাকে। তাঁরা নিজেদের তৈরী মন্ডপে পুজো সারছেন। আমার দিকে ফিরেও তাকান না। আমি ঠিক করেছি—'বনানীকে বিবাহ করিব'। এখন স্কুল মাস্টার অতি সজীব বস্তু। আমরা নাকি অনেক আত্মপ্রত্যয়ী, ও মানসিক বুদ্ধি সম্পন্ন। আমার নিজের গ্রামের স্মৃতি মাঝে মাঝে হানা দেয়। মা মারা গেছে। বাবা অক্ষম মিনতির সুরে তার জরাজীর্ণ অবস্থা জানায়। আমি দ্বিধায় পড়ি। বন্ধুরা সব লেখক হয়ে যাচ্ছে। আমি মাটির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথ তো তাই বলেছিলেন। আমার তিন বিঘে জমিতে গরমের ধান লাগিয়েছি। মাদার থেকে পুঁইশাক উঁকি মারছে। আর কিছুদিন পরে মাচা করে দেব। প্রানের প্রবহমান আবেগে ওরা বাঁচবে। আকাশে তারা ফুটে বেড়ায়। মালী পুকুরের জলে স্তব্ধ নিরবতা। আমি বাঁচতে চাই এভাবে বাঁচতে চাই। কয়েকদিন আগে আমার ধানক্ষেতে ইউরিয়া দিয়েছি। এখন সবল সতেজ চারা। এবার যা চাল পাব তাতে আমার সারা বছরের খোরাকি হয়ে যাবে। এখন বাবা আমার কাছে থাকে। সরকারি জলনিকাশি নালায় বাবা খ্যাপলা জাল ফেলে—। আমি বসে বসে গান শুনি। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের—আমার মল্লিকা বনে···যখন প্রথম ধরেছে কলি। শিশিরে শিশিরে এক অস্পষ্টতার মধ্যে ফুটে ওঠে বনানীর মুখ। মা কালীর মুখের মতো কালো পিত্তল মূর্তি। এক স্বর্গীয় উজ্জ্বলতা যেন বিশেষ প্রসাধন

নিয়ে নিজস্বতায় ফুটে বেরুচ্ছে। জানি না ও এ মেয়ে মুখের মেলানিনগুলো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে না তো। কিন্তু ও কি জানে আমার সারা আকাশ ওর দিকে তাকিয়ে—মেঘ ছেঁড়া আলোয় ওকে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে।

আমার বন্ধুরা অযোধ্যা পাহাড়ে যায়। টাকীর ইছামতীতে স্নান করে—আমাকে ডাকে না। খবরের কাগজে জল মেশানো গম্ভীর পোস্ট এডিটরিয়ল লেখে। ওরা কান পেতে শোনে নীরবের কানাকানি। কিন্তু আমি পড়ে আছি দিক শূন্য পারের নীলিমার বাণী শোনার জন্য। নিজেদের তৈরী মন্ডপে ওরা থাক। আমি এখানে আছি বেশ।

আমার মেস বাড়িতে, স্টাফরুমে বনানীকে নিয়ে কথা ওঠে। কবে বিয়ে করছি। শম্ভুবাবু বলেছিলেন—তাড়াতাড়ি কুলে পড়ুন—অনেক পয়সা পাবেন। চাই কি মারিকদের জমিটাও পেয়ে যেতে পারেন। বিয়ে করলে যে জমি পাওয়া যায় জানতাম না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, জমি, জল শাকপাতা আমাকে টানছে। কেঁদোর মাঠ আমাকে গত জন্মের স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এখন আমার রাতে ভাল ঘুম হয়। বাপ বেটায় থাকি। স্বহস্তে রন্ধন। নরেশবাবুর সঙ্গে স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাঠে দেখা হয়। দামোদরের পাড়ে বকুলগাছটার নিচে বসি। একদিন এখানে বনানী আর আমি বসেছিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম—বনানীর স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। বনানীর কবিতা আমি কোথাও পত্রস্থ করতে পারি নি। আমার ক্ষমতা বুঝে নিয়েছে। আমি যে জলে জমিতে ক্রমশঃ সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছি—কলকাতার সরস আলোকমালা ওদের চারপাশে। জীবন হয়তো ওখানেই সেফ।

রাস্তার পাশে বসে থাকি। এই মাত্র কলকাতা থেকে লাস্ট বাসটা চলে গেল। আমি ইন্দ্রর জন্য বসে ছিলাম। ও আসব বলেছিল। কলকাতার গল্পমালা আমার খুবই শুনতে ইচ্ছা করে। আমি তো এখন কলকাতার বাইরে, লেখালেখির বাইরে, স্বপ্নের বাইরে। বনানী এখন কলকাতায়—একরাশ সহানুভূতির স্মৃতি উপহার দিয়ে কলকাতাবাসী। আমি অনেক সন্দেহজনক উপস্থিতির মধ্যে আছি। জলে, জমিতে, কর্মক্ষেত্রে অন্য এক নির্মাণের অপেক্ষায়—। ইন্দ্র আসে না আমি জানি আসবে না। উন্মুক্ত উল্লাস ভরা দিনগুলো অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। আমি এই নৈরাশ্যের আবহে মুক্তি খুঁজি, জলে জমিতে আশার সঞ্চারণ ঘটাই…। □

● কবিতা

মুক্ত আকাশ

জুল সুপেরভিয়েল

অনুবাদ : **মঞ্জুর দাশগুপ্ত**

আকাশের মাঠে
আমার একটি ঘোড়া
আর আমি ভাসলাম
জ্বলন্ত দিবালোকে।
কিছুই পারে না থামাতে আমাকে
না জেনেই আমি ভেসে চললাম,
সে ছিল জাহাজ
আসলে সে ঘোড়া নয়,
আসলে সে ছিল আমারই ইচ্ছা
জাহাজ মোটেই নয়,
তোমরা দেখোনি
যেমন সে ঘোড়া,
যোদ্ধার মাথা,
ভাবাবেশ উর্দিটি,
বাতাসের চিহ্নি
ঝাপানোর সাথে।
চেপে বসি প্রতিদিন
আর দিই হাতছানি :
'আমার পথের অনুসারী হও,
প্রিয়তম বন্ধুরা,
আসতেও পারো।
রাস্তা শান্ত
আকাশ মুক্ত।
কিন্তু কে বলে এইসব কথা ?
বিশাল উঁচুতে

নিজেকে হারাই নিজের দৃষ্টি থেকে,
তোমরা কি খুঁজে দেবে
সেই আমাকেই
একটু আগেই যে বলেছে এত কথা
এবং এখনো বলে যেতে থাকে ?
তোমরা বন্ধু
তোমরা কি সেই রয়েছ আগের মত ?
একজন মোছে অন্যজনকে
ঊর্ধ্বচারণে এবং সে বদলায় ।'

[জুল সুপেরভিয়েল ১৮৮৪ সালে মঁতেভিদিও-তে জন্মেছিলেন। শিশুকালেই বাবা মা হারিয়ে আত্মীয়দের কাছে উরুগুয়েতে বড় হতে থাকেন। তাঁকে ফ্রান্সের স্কুলে পাঠানো হয় পরে। যদিও তাঁকে ফ্রান্সে পাঠানো হল তবু তাঁর মন জুড়ে রইল দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র, আকাশ, বাতাস আর অরণ্য। পরাবাস্তবতার প্রান্ত ছুঁয়ে থাকলেও তাঁকে 'স্বভাব কবি' বলা হত। পশুপাখি, গাছপালা, খনিজ পদার্থের সঙ্গে তিনি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসতেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রচনারাজির মধ্যে ছিল অসামান্য সঙ্গীতময়তা—ছিল নিরুপিত ছন্দের প্রতি আনুগত্য। আপাত সহজ কবিতা আসলে নিগূঢ় রহস্যসঞ্চারী একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে দিয়ে মূর্ততা ও বিমূর্ততাকে ব্যঞ্জিত করেছেন।

হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাপীড়িত কবি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন অথচ শান্ত ও অন্তরঙ্গ কৌতূহলে তাকে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা করেন নি। তিনি অসীম শূন্যতার ভিতর পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর কবিতায় একটি প্রতীক বারে বারে ফিরে এসেছে—একটি ডুবন্ত মানুষ শুধুই ডুবে যাচ্ছে জলের অতলে অথচ মরছে না বরং সে গভীর জলের অচেতন স্বপ্নজগৎকে উন্মোচিত করছে। যদিও তিনি জীবন ও মৃত্যুর দোলায় দুলেছেন—আত্মা ও শরীর আর স্বপ্ন ও বাস্তবতার দোলায় দুলেছেন আর কবিতায় তা সঞ্চারিত করেছেন তবু তাঁর কবিতা বিশেষ ভারী হয়ে ওঠে নি কারণ এক নির্মল পরিহাস তাঁর কবিতার শব্দে অনেক সময়ই অন্তর্নিহিত থাকত। তাঁর স্মৃতিমর্মরিত কবিতায় জাহাজও একটি প্রিয় প্রতীক হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে। অসম্ভব জনপ্রিয় এই কবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা কবিতাগুচ্ছে আশা ও প্রতিরোধের কথা বলে জনচিত্তকে আরো উদ্বেলিত করেছেন। পরিণত বয়সেই এই বিখ্যাত কবি প্রয়াত হন ১৯৬০ সালে।]

কোজাগরী

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

দৃশ্যপটে কোন জ্যোৎস্না নেই
কোজাগরী রাতের আকাশ ধূমল মেঘ ছাওয়া
অবিশ্রাম বৃষ্টির বিলাপ
অস্ত গেল রূপেরও পূর্ণিমার রাত
দুধের ফোয়ারা ছড়ায় না চাঁদ
হাত বাড়ায় এ কোন জহ্লাদ !

মনে পড়ে তোমাদের মুখ
পৃথিবীর অসুখবিসুখ দূর করে দেবে নবান্ন উৎসব
কবি ও কৃষক
বুনে যায় গন্ধময় সেই স্বপ্নে স্বর্ণবর্ণ জীবন আমন অগনন
প্রাণের ফসল
উদ্ধত ধানের শীষ শিশিরের শীতল বিন্দু
বুক ভার টইটম্বুর দুধ জমে ক্ষীর হয়
জনের বোঁটায় অমৃতক্ষরণ অনুভব
জ্বলন্ত নক্ষত্র বেয়ে এ সময়
ফোটা ফোটা জল
সন্তান প্রসব বেদনায় অমল আনন্দে ক্ষরিত
পৃথিবীর যত বিষ হলাহল
শুষে নেয় নক্ষত্রের দ্যুতিস্নিগ্ধ শীতল আগুনে

ফসলের সবিস্তার দিগন্ত প্রসার হুলুস্থুলু ধানধন্য ঢেউ
তরঙ্গ মালার মধ্যে
ভরা কোটালের টানে নৌকোর গলুই আমি
দোলাতে দোলাতে দাঁড় বাই
আকাশের গায়ে আছড়ে পড়ি মিশে
সারা অঙ্গে সোনারঙ ধান বাণ খসখস শব্দ শীষে
ফসল শিশুর মুখে দধিগন্ধ পাই

স্নায়ু চাপ

শচীন দত্ত

চেতনার অভ্যন্তরে
সাহসী ঘাসেরা
গুচ্ছে মূল অনায়াসে গভীরে ঢোকায় ।

ঘূর্ণিপাকে ঘোরে মন
অজস্র বিন্যাসে
বিবেকের স্তরগুলো অক্লেশে কাঁপায় ।

চিত্রপটে রেখা ওঠে
বিচিত্র তরঙ্গ তুলে
মস্তিষ্কের কম্পিউটারে রেখে যায় ছাপ

দুর্বোধ্য সে রেখা-লিপি
শরীরী সংঘাত
মনের আঙিনা জুড়ে বাড়ে স্নায়ুচাপ ।

চেতনা

সৌমিত্র বসু

সর্বনাশ । কোন আকাঙ্খার উৎস থেকে শূন্যে ভেসে এলো
অথবা ভাসিয়ে নিলো আমাদের গ্রাম যাবতীয় বর্ণসমারোহ
এই তো চোখের জল, একেই কি লুণ্ঠন বলে ?

আজ কোনো ক্ষতির সংবাদ নয়, বুকের গভীরে বাজে যন্ত্রণার গান
আর ইতিহাস টুকে রাখে আপাতমধুর । যে কোনো গোপন
তোমার কথায় আজ গোপন রেখেছি
যদি পারি গোপনে হারাবো ।

আলো

ব্রত চক্রবর্তী

সহিষ্ণুতার জানালাগুলি খোলা
তাই এখনও তোমার আলো লাগে
দরজা বন্ধ করেছিলাম, তালা
দিয়েছিলাম তোমার দিকে রাগে
আমার এখন ব্যস্ত বেলা, সাঁঝ
পরাণকথা শোনার সময় কই
তোমার এবং আমার ভুবন মাঝ
সময় তোলে উদাসী এক হাই
নৌকো নিয়ে যেতাম একদা-ই
মনে পড়ে, ভীষণ মনে পড়ে
সকল নরম পর্দা ফর্দাফাই
অবিমিশ্র কবিতার-ই ঝড়ে
তবু সেদিন নেহাৎ সহিষ্ণুতা
জানলাগুলি রেখেছিল খুলে
বলেই আজও ছাপিয়ে মুখরতা
তোমার আলো আসে গরাদ গলে।

উৎস

বিজয় কুমার দত্ত

উত্তরে কয়েক পা হাঁটলেই তার দরজায়
পে'ছে যাওয়া যেত ঃ
কিন্তু হঠাৎ এই মাঘের হাওয়ায়
দক্ষিণী বাঁক, আমাকে নিয়ে গেল
বিপরীত ভ্রমণ বিহারে।

আসলে কথাটা উত্তর-দক্ষিণের নয়,
এমন কি আলোছায়ায় মেশা
পুব-পশ্চিমেরও নয়—

আসক্তির কি কোনো দিগ্বিদিক আছে ?
কখনো থাকাও সম্ভব !

উত্তরে কয়েক যোজন হাঁটলেও
দেখতে পাবনা তাকে, অথবা
শুনতেও কি পাব তার বুকের
ওঠানামার ছন্দ ?

আমি আর কোনো দিকেই হাঁটিনা
আমার পায়ের নিচে এখন
আদিম যুগের উদ্ভিদের গোপন শিকড় ।

চুক্তিপদাবলী—১৭

চিত্তরঞ্জন হীরা

লবনাক্ত জল গড়াতেই চোখ অমরতা বেঁচে থায়
পক্ষের মেয়ে নেচে ওঠে কনখল থেকে ।
বীতশোক কবি একটু একটু করে খুলে দেখে
মৃত্যুর পাতা । পাতার উপর তিন চোখ···

এতে সর্বনাশ যতটুকু আঁকা ছিল আপাত বিশ্বাস ।
দেখেছ নীল বলে রাধার আঁচল ওড়ে হলুদ হাওয়ায়
পদাবলী নিকেতন থেকে কে বাজায় সন্তুর !
শ্রুতি এসে পাঠ দেয় তাকে কৈলাস শিখরে ।

নাবালিকা বেদ সকাল থেকেই গলা সাধে ।
জনন কাহাকে বলে ? আজন্ম জন্মেজয়···
নারী ও পুরুষ ছাড়া আর কোন্ অরূপ রতন
'আজ তোর ছুটি যা, খেল্ পুতুলের বিয়ে' ।

একফোঁটা মেয়ে শ্মশান খেলছে দুহাত ছড়িয়ে

বুড়ি গল্প বলে

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

সারাদিন ধরে বুড়ি গল্প বলে।
অফুরান গল্প, শীতের রোদ্দুর, বুড়ির কুঞ্চিত ত্বক
পিঠ জুড়ে।
একটার পর একটা গল্প, কেন জানি মনে হয়,
ঢেউয়ের মত, আসছে তো আসছেই—
অবিরাম।
বলবার ভঙ্গীতে ওঠানামা নেই খুব একটা, তবু
ইচ্ছে না হলেও আমরা ক'জন বুড়িকে ঘিরে গল্পে
সম্মিবদ্ধ হয়ে যেতে থাকি।
গল্প শুনতে শুনতে প্রত্যেকবারই ভুলবশতঃ মনে
হয়, গল্পেরা প্রত্যেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ, নিটোল, গল্পেরা কেউ
কারো নয়।
কিন্তু বুড়ি প্রত্যেকবারই অভ্যস্ত মসৃণতায় ছুঁচে পরায়
পুরোনো সুতো, তারপর নতুন ফোঁড়, শ্রাবনের পালি সরিয়ে
আমরা পুরোনো নোঙর দেখি।
গল্পগুলো শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে বিস্বাদ, ছকে
বাঁধা মনে হয়, যেমন ঘুলঘি থেকে দাবানল না হবার
গল্প, মাঝে মধ্যে দুয়েকটা হবারও।
তারপর অন্ধের লাঠি হাতে বেড়াবার গল্প, ঘোড়ার
বল্গা হাতে নিয়ে হাতের মুঠোকে বিশ্বাস করার গল্প
এরকমই আরো কিছু ছক।
কিন্তু ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, বুড়িকে ঘিরে
আমরা কয়েকটি প্রাণী গল্প শুনে ও ক্রমে ক্রমে গল্প
হয়ে পেরিয়ে চলি সময়ের তেপান্তর।

তক্ষক

সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখে রাখছি বোধ
যা কবিতা নয়, যা রক্তে নেচে ওঠে মাঝে মধ্যেই ।
যে সুন্দর তাকে চুম্বন করিনা আজো
সুন্দর আমাকে চুম্বন করিবেনা কি একদিন ।

যে সুন্দর তাকে স্পর্শ করিনা
স্পর্শ আমাকে অধীর করে তুলিবেনা কি
ভালোলাগে বলে দেখি চেয়ে চেয়ে
দেখিতে দেখিতে ভালোবাসা বক্ষে ধরিয়া আছি বহুকাল ।
ভালোবাসার মুঠি ধরে টুঁটি টিপে
আমি কখনো ভালোবাসা চাইনি ।
তাই কেবলি ভাঙ্গন, মৃত্যুময় এককী এমন ।
তাই এই সব গান আমার জন্য নয়
এইসব ঋতু স্নান আমার জন্য নয়
বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখে রাখছি বোধ, যা কবিতা নয় ।
আমার সৃষ্টির উপরে বসে ডেকে যায় এক তক্ষক ॥

কুসুম

হৃদীপ্ত বিশ্বাস

হয়তো ওদের ঘুম ভাঙানোর শেষ
দেখবে তোমার ভালোবাসার রেশ

সারারাত শিশির ভেজা মন
কুসুম রোদ মেখে গলতে শুরু করেছে
ঢালবে, ঢালবে প্রাণভরে
তরল ভালবাসা ।
ছোঁয়াও আঙুল, মাথা, নখ, কান

ব্রহ্মতালু থেকে ব্রহ্মাণ্ডের শিরা উপশিরায়
লাগাও তোমার অতি কোমল ধৈবত
মীড়ের খাঁজে শেকড়ের মতো টানো শ্রুতি
পরতে পরতে খোলো, পুড়তে পুড়তে জ্বালো।
কুসুম তুমি কার খোঁজে অনন্তকাল
ভোরের সুরবাহার হয়েছ ?
কতগুলো কাদা খোঁচা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লেপ্টে থাকা
খোসার মধ্যে অহর্নিশ লালসায় মত্ত
কোন কথাই মর্মে পৌঁছবে না, তবু চেষ্টা করো
হয়ত তোমার ঘুম ভাঙানোর রেশ
দেখবে ওদের ভালোবাসার শেষ ॥

নতুন ফসল

সুশীল কুমার চক্রবর্তী

আষাঢ়ের আকাশে হামা দেয় মেঘ
অজ্ঞাত কোন রূপসীর
এক ঢাল কালো চুল—
প্রেমিকার নিবিড় আলিঙ্গন
প্রেয়সীর গোপন চিঠি।
আজ অমৃতের আস্বাদ
কাঁচা পেঁয়াজ পান্তা ভাতে।
চঞ্চল পায়ে আল ধরে যায় মাঠে
ক্ষেত মজুরের অন্তঃসত্ত্বা বৌ
মাতৃত্বের উষ্ণতা জঠরে তার।
আগামী ভোরের সোনালী স্বপ্ন
অনাগতের দৃঢ় অঙ্গীকার ঃ
সুবর্ণ ফসল স্ব-ভূমে স্বকৃত।
ভূমিহীনের নিশ্চিত প্রত্যয়—
অঘ্রাণের শিশির-সিক্ত নতুন ফসলে
নব-জাতকের নবান্ন,
বুভুক্ষার অবসান—প্রাণের শর্ত।

প্রেমপত্র

অরিন্দম দত্ত

এক

একটি মেয়ে শব্দ নিয়ে মেঘের কাছে ভাসতো
মেঘলা পড়ে ছাদের উপর অকারণেই হাসতো
দেখা হলেই···'এই যে কবি কোথায় ছুটে যাচ্ছো
আমি বলতাম উপর থেকে নিচে কবে নামছো ?

যেই না বলা ওমনি মেয়ে মেঘের থেকে পড়লো
অসুখ-বিসুখ নিয়ে আমার মাথার উপর চড়লো
আমি বললাম—রাক্ষুসি তুই···এমন ভাবে চড়ে
খিল খিলিয়ে বললো মেয়ে পদ্য লিখলে মরে

মরি মরবো তোর তাতে কী···তুই তো সর্বনাশি
যেই না বলা ওমনি মেয়ে বললো তবে আসি
ধোয়ার মতন পাক খেয়ে সে মেঘের কাছে ভাসলো
লেখ কবিতা কেমন লিখিস বলেই আবার হাসলো

ভাসলো মেয়ে হাসলো মেয়ে একাকী আজ একা
শব্দ নিয়ে জলস্রোতে কিংবদন্তি থাকা
নদীর কাছে, মেঘের কাছে একলা পাথর আসছে
শেষের কথা লিখছিনা তাই ভীষণ কান্না পাচ্ছে···

দুই

মেধার কাছে বিষাদগ্রন্থ মূর্তি পড়ে আছে
নিয়ত থাকে জড়িয়ে আজ থাকা
বুকের 'পরে আগুন চলমান
ভেবেছিলাম আজই পাব দেখা

ভেবেছিলাম আঁচল ভর্তি কুড়িয়ে আমায় নেবে
পথের পাশে ছড়িয়ে ছিলাম তাই
এমন সময় এলে ছোট্ট মেয়ে
কুড়িয়ে নেবে তোমার সাধ্য কোথায়

বিষাদগ্রন্থ মূর্তি ভাঙে সাপের পর্যটনে
আজই তোমার আসার কথা ছিল
চলে যাব ভাবছি এবার কোথাও
কুড়িয়ে নেবার আজই সময় হলো···

তিন

···অথবা ধুলোয় রেখে চলে গেছে সে···
ফিরে তাকাবার অবসর ছিল না
ছিলনা ঐতিহাসিক পর্যটনের সাধ
নির্বিকার চলে গেছে সে···

নির্দিষ্ট পরিক্রমা জানা ছিলনা আমার
মৃত্যুর স্থাপত্য ছিল প্রিয়তম সন্যাসে

বহুদিন এই ওষ্ঠ ভিজিয়ে দেয়নি সে
কুড়িয়ে নিতে পারেনি এই দেহ
বহুকাল বকুল ছড়িয়ে দেয়নি সে
বকুলের অভিমান হলো

পারতপক্ষে আমিও বকুলের কাছে দাঁড়াইনি কখনো
বকুলের রক্তমাংসে করিনি একাকার
তাই রক্তেরও অভিমান হলো ··

অথবা ধুলোয় রেখে চলে গেছে সে
ধুলোও আমায় রেখে চলে গেছে বহুকাল হলো···

● সাক্ষাৎকার বাঙলাদেশে তসলিমা ইহবাদী চৈতন্য জাগাতে চেয়েছেন

—শামসুজ্জোহা মানিক

[গত এপ্রিলে বাঙলা দেশের MARC (Multidisciplinary Action Research Centre থেকে শামসুজ্জোহা মানিক এসেছিলেন কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখার উদ্দেশ্যে মানিক সে সময় বিনয় চৌধুরী এবং বিমান বসুর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সামনেই সাধারণ নির্বাচন থাকায় মানিকের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বাঙলা দেশও তখন নির্বাচনের প্রতীক্ষায়। ঢাকা প্রত্যাবর্তনের আগে কলকাতার 'একুশ শতাব্দী'কে একটি একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন মানিক। আমরা সাক্ষাৎকারটি এ সংখ্যায় প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক]

❑ ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিষয়ে আপনি গবেষণা করছেন। বাঙলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। সেখানে একাত্তরে অর্জিত স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কী ধরণের কাজ আপনার চোখে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে ?

❑❑ ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে একাত্তরের পর থেকে বাঙলাদেশে কাগজে কলমে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুব করা হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। তাছাড়া জমির সিলিং নির্ধারণ, বর্গাস্বত্ব, কৃষি মজুরির সর্বনিম্ন হার নির্ধারণ ইত্যাদি কিছু সংস্কারমূলক আইন বিভিন্ন সরকারের সময়ে করা হলেও বাস্তবে সেগুলোর প্রয়োগ তেমন একটা ঘটেনি। সিলিং অতিরিক্ত জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের ঘটনা আমার জানা নেই। কিছু খাস জমি বণ্টন হলেও প্রকৃত ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক খুব কমই উপকৃত হয়েছেন। এমন ঘটনার কথাও আমাদের জানা আছে যে, সরকারী কর্মকর্তাকে ভূমিহীন দেখিয়ে খাস জমি দেওয়া হয়েছে। আসলে ভূমি সংস্কারের আইনগুলো সেখানে ভূমি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করার বেশি তেমন কিছু করেছে বলে মনে হয় না। কারণ আইন এড়াবার জন্য জোতদাররা অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দেন। তাছাড়া সরকারী বাস্তব পদক্ষেপ না থাকায় আইন তৈরী করা হলেও জোতদার কিংবা বড় জমির মালিকরা তাঁদের সন্তানদের মধ্যে জমি এমনভাবে ভাগ করে দেন যে, অনেক ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও আর সম্ভব হয় না। তাছাড়া বেনামী হস্তান্তরের ব্যাপার তো আছেই। বর্গাস্বত্বেরও কোন মূল্য নেই।

বর্গাদারদের যখন তখন অধিকারচ্যুত করা যায়। মোট কথা বাঙলাদেশে ভূমি সংস্কারের গোটা ব্যাপারটাই এখন পর্যন্ত মূলত কাগুজে ব্যাপার।

□ কৃষকের স্বার্থানুকূল ভূমি সংস্কারের পথে মৌলিক বাধাগুলি সম্পর্কে কিছু বলুন। ধর্মীয় সংস্কার কি সেখানে বিশেষ অন্তরায় ?

□□ বাঙলাদেশে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা এক বিরাট প্রতিবন্ধক। পশ্চিমবঙ্গের মত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সেখানে নেই। ফলে সমস্ত ক্ষমতা সেখানে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত যা সারা দেশে বিস্তৃত প্রশাসনিক জালের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে। এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ থাকলেও তার ক্ষমতা খুবই সীমিত। ইউনিয়ন পরিষদ আমলাতান্ত্রিক থানা এবং জেলা প্রশাসনের অধীনে কাজ করে। বস্তুত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় এখনও সেখানে জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা সেখানে বিপুল। তার উপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ধরণের এক আমলা-তান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে সেখানে যে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল আছে যে কোন ধরণের ভূমি সংস্কারের পথে তা বাধা।

অবশ্য গ্রামাঞ্চলের কৃষক জনগোষ্ঠীর অসচেতনতা ও অসংগঠিত অবস্থাও কম দায়ী নয়। কারণ এইরকম এক দুর্নীতি এবং পীড়নমূলক আমলাতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের শক্তিটা তো আসতে হবে জনগণের ভিতর থেকে। আর এ প্রশ্নেই আসে ধর্ম হিসাবে বাঙলাদেশের প্রেক্ষিতে ইসলামের ভূমিকার কথা। ইসলাম যে ধরনের মন মানসিকতা ও সামাজিক শৃংখলা বা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গড়ে তোলে তা জনগণকে আমলাতান্ত্রিক এবং একনায়কী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ করে তোলে। কারণ ইসলাম নিরংকুশ ভাবে এককেন্দ্রিক। এই অবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক যে কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের পাল্টা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এক দুঃসাধ্য কাজ হয়ে আছে আজ অবধি। যত নিচের দিকে যাওয়া যায় সমস্যাটা তত প্রকট হয়। এই জন্য আমাদের সমাজে পরিবর্তনের প্রধান শক্তিগুলো সাধারণত সমাজের মধ্য স্তর থেকে আসে। বিশেষত কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে এখনও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি এমন শক্তি হিসাবে ছাত্র ও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণত সবচেয়ে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে।

□ পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এসেছেন। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই।

□□ এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সামনে নির্বাচন থাকায় এবার আমার এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কারণ এখন রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। এবারে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলো বই-পত্রের মাধ্যমে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অগ্রগতি সম্পর্কে সরেজমিন অভিজ্ঞতার জন্য আমাকে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আবার আসতে হবে। আর তখন আমার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

□ স্বাধীন বাঙলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম মূলস্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বিগত সিকি শতাব্দী ধরে সেই আদর্শ শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সহ সামগ্রিক জনজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে ?

□□ এটা অনেক পূর্বের কথা। সেনাপতি শাসক জিয়াউর রহমানের শাসনকাল থেকেই সংবিধান থেকে secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয় এবং তার জায়গায় আল্লাহ্‌র বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া সংবিধানের ঘাড়ের উপর চাপানো হয় 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম'। এরপর আরেক সেনাপতি শাসক এরশাদ সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। সুতরাং সিকি শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে secularism বা ইহবাদের অস্তিত্ব থাকল কোথায় ? বরং দুই দশক ধরে রাষ্ট্রীয় পরিসরে চলছে ইসলাম এবং সেই সঙ্গে তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িকতার অনুশীলন।

তবে বাঙলাদেশের উদ্ভব তো secular বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। সুতরাং বলা যায় যে, এই চেতনা থেকে '৭১ এ যে মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছিল তা আজও চলছে বিভিন্ন রূপে। বাঙলাদেশের বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠার অদম্য লড়াই-এর ছাপ পড়েছে সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সহ সামগ্রিক জনজীবনে।

□ জনগণের এক ব্যাপক অংশ যখন তসলিমা নাসরিনের মৃত্যুপরোয়ানা জারি করে তখন আশঙ্কা হয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে দাঁড়িয়েও ধর্মীয় মৌলবাদ মধ্যযুগীয় স্পর্শকাতরতায় আচ্ছন্ন। আপনার অভিমত কী ?

□□ এখনো পর্যন্ত অবস্থাটা তাই। তবে এই অবস্থা বদলাবার সংগ্রামটাও এগিয়ে চলেছে। সেই দিকও আমাদের দেখতে হবে। আর এটাও কি কম

বিস্ময়কর নয় যে, ঐ রকম এক সমাজে তসলিমার মত এক বিদ্রোহী নারীর আত্ম-প্রকাশ সম্ভব হয়েছে ? পনেরো কি দশ বৎসর পূর্বেও কি তসলিমার মত করে প্রকাশ্যে কথা বলা সম্ভব হত ? তাঁর লেখার পাঠকও তো সেখানে নগণ্য নয়। আর তার পূর্বে তাঁর লেখাগুলোকে প্রকাশিত হতেও তো হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশক, পাঠক সবই পাওয়া গেছে।

□ তসলিমার লেখাকে বাঙলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে গ্রহণ করেছেন ? তাঁরা কি মনে করেন তসলিমা যথার্থই একটি ভীমরুল চাকে পাথর ছুঁড়েছেন ?

□□ তসলিমার লেখার প্রশ্নে বাঙলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মনোভাব ইতিবাচক নয়। বিশেষ করে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের বেশির ভাগই তসলিমার বক্তব্য মেনে নিতে পারেন নি। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে বক্তব্যও দিয়েছেন। তাঁদের কারো কারো মনোভাব আমি বুঝি। আসলে তসলিম নাসরিন একটা ভীমরুলের চাকে পাথর ছুঁড়ে অনেকের শান্তি ভঙ্গ করেছেন। ভীমরুলের চাকটাকে যাঁরা শান্তি ও মধুরতার আলয় হিসাবে ভাবতে কিংবা ভাবাতে চেয়েছিলেন কিংবা এর বিপদ সম্পর্কে ভুলে থাকতে কিংবা ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আর এইভাবে মানসিকভাবে শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে চেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা তাঁদের সেই শান্তির জগতটাকে লন্ডভন্ড করেছেন।

□ যেহেতু তসলিমার পক্ষে লেখক বুদ্ধিজীবীদের কলম সোচ্চার নয়, আমরা কি ধরে নেব তাঁর লেখা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যহীন ? না কি কলমেরও কোন ভয় আছে ?

□□ তসলিমার লেখায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। অনেক সময় তা বেশি একরোখা। কখনও তা ভারসাম্যহীনও বটে। কিন্তু আমার বিবেচনায় সেগুলোই সব নয়। বাঙলাদেশে তসলিমা তাঁর শক্তিশালী কলমের সাহায্যে যা করেছেন আমার ধারণা, তার ফল হবে যুগান্তকারী। এমন সহজে, এমন জোরালোভাবে, তীক্ষ্ণভাবে তিনি যেসব কথা বলেছেন একসময় সেগুলো এভাবে বলার কথা ভাবা যায় নি। তিনি এমন কতকগুলো সত্য তুলে ধরেছেন যা ইতিপূর্বে তাঁর মত করে আর কেউ করেন নি। এ যুগে আর কোন নারী বাঙলাদেশের মত ইসলাম শাসিত সমাজে নারীর বেদনা এবং মুক্তির আকুতিকে

এমনভাবে ভাষার রূপ দিয়েছেন ? তাছাড়া তাঁর লেখা সবক্ষেত্রে আবেগ-সর্বস্ব নয়। যথেষ্ট যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা তাঁর অনেক লেখাই জোরালো হয়ে উঠেছে অনেক গুণে। আমি এভাবেই তার মূল্যায়ণ করি। সুতরাং তাঁর লেখা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যহীন এ কথা আমি মনে করি না। আমি আরও মনে করি তসলিমার যুগান্তকারী ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ণ হবে আরও অনেক পরে।

□ ব্যক্তিগতভাবে আপনি কি মনে করেন দেশের সমকালীন প্রেক্ষাপটে এবং সবার উপরে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে তসলিমার আক্রমণাত্মক লেখা সময়ের দাবীকেই মেনে নিয়েছে ?

□□ আমাদের সমাজ-মানস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্থূল। খুব জোরে না বললে যেমন তার কানে কথা ঢোকে না তেমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে সন্ত্রস্ত করতে না পারলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠা বিরোধী কাউকে গুরুত্ব দিতে চায় না। সুতরাং কতকগুলো একান্ত বাস্তব এবং জীবন্ত সত্যকে সবার মনোযোগে নেবার জন্য তসলিমার সামনে এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল আমি জানি না। নারীর সত্তা এবং মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি উদাসীন এবং প্রকৃতপক্ষে বৈরী এক সমাজ-মানসকে প্রবল ভাবে আঘাত করতে না পারলে কিভাবে মানুষকে নূতনভাবে ভাবানো সম্ভব ? তসলিমা এই কাজ করতে চেয়েছেন তাঁর আক্রমণাত্মক লেখার মাধ্যমে। আসলে তিনি একটা বিরাট কাজ করেছেন। সেটা হল যুগ যুগ লালিত এক মীথ বা অতিকথায় তিনি মর্মান্তিক আঘাত হেনেছেন। মৌল ইসলামের সঙ্গে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত সম্পর্কটা তাঁর বিরুদ্ধে মৌলবাদের তান্ডবের মাধ্যমে কি নূতনভাবে উদ্ঘাটিত হয় নি ? একটা হিংস্র ব্যবস্থাকে যারা ভয়ে হোক আর ভক্তিতে হোক কিংবা অজ্ঞতায় হোক সকল শান্তি আর সাম্যের এক নিবাস হিসেবে চিত্রিত করতে চাইতেন এবং কথার মোহজাল বিস্তার করে তার হিংস্রতাকে ঢেকে রাখতে চাইতেন তসলিমা সেই ব্যবস্থার মর্মে ঘা মেরে তাঁদের সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা আসলে কি। আর এইভাবে তিনি সেদেশে অসাম্প্রদায়িক ও ইহবাদী চেতনা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথটাকেও অনেক বেশী আলোকিত করেছেন।

□ এ বিষয়ে দেশের অন্যান্য লেখক বুদ্ধিজীবীরা আপনার সঙ্গে কতটা সহমত পোষণ করেন ? বিশেষত বামপন্থী লেখক-মহল ? রাজনীতিগত ভাবে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ?

□□ তসলিমা পরলোকবাদী ধর্ম বিশেষত ইসলামকে আঘাত করেছেন এবং আঘাত করেছেন পুরুষতন্ত্রকে। এই সবই করেছেন জোরালো কণ্ঠে। সুতরাং এই রকম ধর্ম ও পুরুষতন্ত্র শাসিত সমাজে তসলিমাকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পছন্দ করলেও উপর তলার লেখক বুদ্ধিজীবীদের কয়জন সমর্থন করবেন? বহুকালের সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করা কি এতই সহজ? নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বা ইহবাদী, যুক্তিবাদী বললেই কি সব সময় তা হওয়া যায় পুরোপুরি? কিংবা পুরুষতন্ত্রী নই এবং নারীকেও সম অধিকার সম্পন্ন মানুষ মনে করি—একথা বললেই কি নারীর স্বাধীন সত্তার প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন? আর বাঙলাদেশের বামপন্থী লেখক মহল? তসলিমা তো ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রতি যেমন, তেমন তাদের প্রতিও এক হুমকি। কারণ যাদের কাছে শ্রেণী সংগ্রাম আর সমাজতন্ত্রের বাঁধা ছকেই আছে নারীর সব সমস্যার সমাধান, সেখানে তসলিমা সর্বহারা শ্রেণীর বাইরে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপস্থিত করেছেন এবং সমস্যার স্বতন্ত্র সমাধান চাইছেন যে সমাধান সমাজতন্ত্র হলেই হচ্ছে না। কাজেই তসলিমাকে বাঙলাদেশের বামপন্থীরা সমর্থন করবেন কেন? বরং একদিকে মৌলবাদীরা যেমন তসলিমার মুণ্ড দাবী করেছে আরেক দিকে তেমন বামপন্থীরাও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং বলা উচিত ঘৃণা উগীরণ করেছেন। রাজনীতিগতভাবে বা সাংগঠনিক ভাবে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি তাঁর বিরোধিতা করেছে এমন কিছু আমার মনে পড়ছে না কিংবা করলেও সেটা আমার জানা নেই। বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তসলিমার মূল্যায়ণে আমার ধারণার সমর্থক খুব কম দেখেছি। কিন্তু শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা তসলিমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি পোষণ করেন। ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, শিক্ষক সহ অনেকে তাঁকে সমর্থন করেন। তবে সাধারণভাবে তাঁরা পিছনের সারির মানুষ। যাঁরা এসট্যাবলিশমেন্ট বা প্রতিষ্ঠা তথা কায়েমী স্বার্থের অংশ তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা প্রগতিশীল যেভাবেই পরিচিত হোন না কেন তাঁদের খুব বড় অংশই তসলিমাকে পছন্দ করেন না। সম্ভবত সে দেশে বিশেষ ধর্ম এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরুষতন্ত্রকে কেন্দ্র করে যে কায়েমী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তসলিমা সেটাকে আঘাত করে তাঁদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে আঘাত হেনেছেন বলে তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া।

সাক্ষাৎকার □ সাগর বিশ্বাস

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪-১০-১৯৩০—১৩-১২-১৯৯৬)

অশোকদাকে প্রথম দেখি রেডিও ষ্টেশনে। সালটা ছিল ১৯৬৪। সে বছর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মারা গেলেন। Demise Programme এ গান গাইতে এসেছিলেন অশোকদা। ফরসা রঙ। সৌম্যমূর্ত্তি। আভিজাত্যপূর্ণ সম্ভ্রান্ত চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। অথচ শান্ত স্নিগ্ধ। ১৪ নম্বর স্টুডিওতে বসে গান গাইছিলেন "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু"। এক সার্থক শিল্পীর নিবেদন শুনে সেদিন বুঝেছিলাম অশোকদা ডুবে গেছেন গানের মধ্যে। সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এরপর কবে যে অশোকদা হয়ে গেলেন আমার দাদা, আর অনিমা বৌদি হয়ে গেলেন শুধু 'বৌদি' তা আজ আমার আর মনে নেই। ৭০-এর দশকের শুরুতে হল "গদ্য নাট্যের গান"। সন্তু মুখার্জী তখনও প্রফেশনাল অভিনেতা হয়নি। আমরাও নতুন। ছিলেন দেবুদা, প্রদীপ (প্রদীপ ঘোষ) রেডিওর শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও অনেকে। সন্ধ্যে-বেলা তরুদার বাড়িতেই হত রিহারসাল। সেকি উৎসাহ আমাদের। তেমনি ছিল আমাদের শেখবার আগ্রহ। শিক্ষক হিসেবে রোজ শুটিং শেষ করে পাহাড়ীদা আসতেন আমাদের অভিনয় শেখাতে। পাহাড়ী স্যানাল অত বড় অভিনেতা, কিন্তু অশোকদার কাছে না এসে থাকতে পারতেন না। দুই অসম বয়সের বন্ধুত্ব দেখতে খুব মজা হোত। মহাসমারোহে আমাদের গদ্য নাটকের গান অভিনীত হল রবীন্দ্রসদনে। কাগজে কাগজে প্রশংসায় মুখর হল কলকাতা। আর তেমনি অসামান্য গান গাইলেন অশোকদা। যেমন সুরেলা গলা, তেমনি থেয়িং। তেমনই ভরাট গলায় পৌরুষের ছাপ। Rehearsal-এর ফাঁকে ফাঁকে বৌদির পাঠানো এক একদিন এক এক রকম খাবার আসতো প্লেটে। সেই খাওয়ার লোভটা আমাদের এত পেয়ে বসেছিল—যেন Rebearal বেশি হলে আমাদের লাভ। টোপালী (অশোকদার মেয়ে) তখন ছোট্ট। ফুটফুটে সুন্দর। দরজার পর্দা সরিয়ে একটা চোখ বার করে আমাদের দেখতো। আর হাত নেড়ে ডাকলেই চট্ করে উধাও হয়ে যেত। কি সুখী পরিবার ছিল অশোকদার। কি একটা নির্লিপ্ত শান্তি বিরাজ করত ঐ বাড়িতে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। ঐ সময় অশোকদা একটা Craze ছিলেন কলকাতায়। অশোকদার একক

অনুষ্ঠান শুনতে না আসাটা কি সাধারণ কি অতেল দর্শকদের একটা ক্ষোভের কারণ ছিল। একক অনুষ্ঠান করে অশোকদা দেখালেন তাঁর গানের দাপট। শিল্পী সাহিত্যিক মহল তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তাঁর পরম বন্ধু অমিতাভ চৌধুরী বিরাট সমালোচনা লিখলেন কাগজে। এলেন সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিশ্বজিৎ দা, বাদশা ঠাকুর। আরও কত মানুষ। আসলে তাঁর গানের মধ্যে একটা যাদু ছিল। কোন শব্দ উচ্চারণে মোচড় দিলে অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠবে, গানের ভেতরে যে আত্মা লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে আনার মন্ত্র তাঁর জানা ছিল। তাই কত অনায়াসে তিনি গাইতে পারতেন "আমার মন মজেছে সেই গভীরে—"এ লাইনটি। যেন গভীর সমুদ্র থেকে তুলে আনা এক একটা রত্ন।

অশোকদার সংগে অনুষ্ঠান করতে বহু জায়গায় গেছি। সব সময় তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবকের মত।

একবার বাল্মিকী প্রতিভায় নিজে অপেরা শো তে বাল্মিকীর ভূমিকায় নামলেন। গৌরীকে বললেন সরস্বতীর ভূমিকায় নামতে। গৌরীতো পালিয়ে বাঁচেনা। কিন্তু অশোকদার ইচ্ছেকে কে বাধা দিতে পারে। নামতে হল গৌরীকে। মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, মালদহ, দুর্গাপুর, কত জায়গায় গেছি তাঁর সংগে অনুষ্ঠান করতে। সে সব স্মৃতি কোনোদিন ভুলবো না। কোনোদিন কোনো আড্ডার অবসরে অশোকদার মুখে কারও নিন্দে শুনিনি। আর পরশ্রীকাতরতা এতটুকু ছিলনা। কত কি যে তার কাছে শিখেছি তা ভাবলে বিস্মিত হই মাঝে মাঝে। অথচ তার মধ্যে ছিল শিশুর মত সারল্য, আমুদে রসিক, এক মজার মানুষও। মাঝে প্রচন্ড শখ হয়েছিল 'প্ল্যানচেট' করার। দেবুদা ছিলেন পরম সংগী। আর যোগেশ। যোগেশ দত্ত, খ্যাতিমান মুকাভিনেতা। বাড়িতে রাত দুটো, তিনটে অবধি চলত এই 'প্ল্যানচেট'। আর শিশুর মত গল্প করতেন আমাদের সামনে, কোন আত্মা কি বলত তাঁদের। তবে এই অশোকদার সঙ্গীত সাধক জীবনের মধ্যে একটি নির্লোভ উদাসীন দার্শনিক কবি লুকিয়ে থাকত, যাকে নিয়ে গল্প করা যায়। কিন্তু সংসার করা যায় না। সেখানে একথাটা আমাদের চেয়ে বেশি কেউ জানতো না যে বৌদির সেবা না থাকলে অশোকদা কোনোদিনই শিল্পী হতে পারতেন না। নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে অক্লান্ত স্বামী সেবা করে গেছেন বৌদি। শেষ দিন পর্যন্ত। তাই বৌদিকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। বড় একা। বড় নিঃসঙ্গ। অশোকদার ঐ ঘর আমাদের তীর্থ আজও। শক্তিদার কবিতাটা মনে পড়ে—

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলনা আষাঢ় শেষের বেলা।

উদ্যানে ছিল বরষা-পীড়িত ফুল, আনন্দ ভৈরবী। □ পার্থ ঘোষ

নীলিমা দাস

(১৯২১—১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬)

কয়েকবছর আগের কথা যেদিন উৎপল দত্তকে শেষ দেখা দেখতে সবাই ভীড় করেছে রবীন্দ্রসদন চত্বরে, ওই ভীড়ের থেকে দূরে এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন কান্নাভেজা চোখে। তিনিই নীলিমা দাস। অথচ মঞ্চে বেতারে চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় ছিল কেমন সতেজ প্রাণবন্ত এবং শিহরিত করা।

আমরা অনেকেই জানি না তিনি শুরুতে ছিলেন নৃত্যনিপুনা। মণিপুরী নৃত্যে পারদর্শিনী। শিখেছিলেন রাজকুমার সিং-এর কাছে। এদেশের প্রখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় দেশ ও বিদেশের বহু স্থানে মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি চলচ্চিত্রে যোগ দেন। তারপর মঞ্চে এল টি জি অর্থাৎ লিটল থিয়েটার গ্রুপে অভিনয়ের মাধ্যমে। শোভা সেনের সঙ্গে যোগাযোগ থেকেই তাঁর মঞ্চের অভিনয়ে আসা বলা যেতে পারে। এল টি জির সেই হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার দিনগুলো থেকেই তিনি ছিলেন। মা সুহাসিনীও অভিনেত্রী ছিলেন।

লেডি ম্যাকবেথ, নীচের মহল, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো, একেই কি বলে সভ্যতা, অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, প্রত্যেকটি নাটকে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তারপর এল টি জির কর্মকান্ড যখন পিপলস লিটল থিয়েটারে বর্তালি তখনও তিনি তাদের সাথে ছিলেন।

সাধারণ রঙ্গালয় বা পেশাদার মঞ্চে নীলিমা দাস বহু অভিনয় করেছেন। শ্রেয়সী নাটকে কেতকী চরিত্র, তাপসী নাটকে সুষমা, একক দশক শতক নাটকে কুন্তী, দাবীতে মিসেস আচার্য, শর্মিলাতে সুপর্ণা, মঞ্জরী নাটকে সুনীতা, সীমা নাটকে শান্তা, বিদ্রোহী নায়ক নাটকে জগত্তারিনী যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নামজীবন'-এ বাসনা আজ নাট্যরসিকরা ভুলতে পারেন নি। অভিনেতৃ সংঘের হয়ে তিনি করেছিলেন বিদেহী, শেষরক্ষা ও অন্ধাযুগ। একবার 'কবি'তেও তিনি অভিনয় করেছিলেন।

নীলিমা দাসের চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রথম পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষনীয়া'য়, কিন্তু 'পরভৃতিকা' আগে মুক্তি পায়। চলচ্চিত্র, বেতার ও মঞ্চের নীলিমা দাস সহজে মুছে যাবেন না।

কেন-না একথা অনেকের জানা—সব যাওয়া যাওয়া নয়, স্মৃতিপটে বারে বারে ফিরে আসা। □

সলিল সরকার

● বইপত্র

পণ্যসংহিতা □ যশোধরা রায়চৌধুরী
কবিতা পাক্ষিক □ ৭ টাকা

লেখাকে যথার্থরূপে কবিতা করে তোলার সহজাত ক্ষমতা আছে যশোধরার। যশোধরা রায়চৌধুরী, যিনি 'পণ্যসংহিতা' নামক একমাত্র কাব্যগ্রন্থের তরুণবয়সী কবি। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দিয়ে নয়, কবিতার প্রকৃত হয়ে ওঠা নিয়েই কথা। এমন অনেক আছেন, যাঁদের কবিতার বইয়ের সংখ্যা অনেক, কিন্তু গুণাবলির দিক থেকে সেইসব বই নিতান্তই নগণ্য। এখানে অবশ্য গুণাবলি বলতে বুঝতে চেয়েছি, আলোচিত কবিতার হয়ে ওঠা, তার নিজস্ব ভাষাভঙ্গি এবং কিছু একটা বলতে চাওয়া। আর ছন্দের বোধ। এই ছন্দ ব্যাপারটা শুনলেই আবার অনেকে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, ওসব সেকেলে ব্যাপার! এখন আর ছন্দের কোনো দরকার নেই। তাই কি?

তা যদি হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। যার যেমন অভিরুচি, তিনি তেমন লিখবেন। তবে শর্ত মাত্র একটি,সে লেখা কবিতা হয়ে উঠতে হবে। ওটাই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় বেশিরভাগ পরিচিত কবিই বিফল। কেননা কবিতা কেমন করে হয়ে উঠবে, তা কেউ বলতে পারেন না, তিনি শুধু লিখে দেখাতে পারেন তাঁর লেখার হয়ে ওঠার চরিত্র। তার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম জায়গা থাকে, যা পাঠককে,—শুধুমাত্র কবিতা রুচি-সম্পন্ন সচেতন পাঠককে প্রাণিত করে। 'আর যা যা করতে পারি সব করে দেখাবো এখন / শোকশূন্য সভা ডাকবো, দুষ্ট দুষ্ট আলস্যরঞ্জনকারী গল্পও বাতাবো / তোমরা হেসে ওড়াবে মজাক।'—যশোধরার এই উচ্চারণে অতিসূক্ষ্ম হয়ে ঘনিয়ে এসেছে কবিতা। তাঁর ভাষাভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। একেবারে মুখের কথা তুলে এনেছেন তিনি। তার মধ্যে আছে দুটি হিন্দী শব্দ 'বাতাবো' ও 'মজাক'। কিন্তু এই ব্যবহার সম্পূর্ণরূপেই মাননসই হয়েছে এবং কবিতার ভিতরমুখী চলন ঠিকই এগিয়ে নিয়েছে। যশোধরা প্রকৃত কবি-ক্ষমতার অধিকারী:

'দেহবোধ থাকলেই তাকে ঘাড়ে ধরে মাটিতে শুইয়ে দেওয়াও থাকবে
কেউ কেউ নিজের প্রেমিকাকে অক্ষিকোটরের মধ্যে ঢুকিয়ে, তালাবন্ধ করে
তারপর বাহিরে যাবে, সফট পর্ণো বিতরণের দোকানে
যেখানে প্রতিটি জঘন্য পত্রিকার সঙ্গে ফ্রি দেওয়া হয়
একটি করে মেয়ে'

এইভাবে সজীব ও অভিনব কল্পনার ছোঁয়া এসে কবির লেখাকে ভিতরে ভিতরে জোরদার করে তোলে। পড়লেই বোঝা যায়, হ্যাঁ, এই হলো কবিতা।

এই কল্পনার অনুষঙ্গ ছাড়া আরো একটি খুব কঠিন ব্যাপার আছে, যাকে বলা হয় কবিতার ভাষাভঙ্গি। এই ভাষাভঙ্গি যাঁর আয়ত্বে আছে, তাঁর লেখা কখনো গদ্যরচনার সীমাবদ্ধতায় ধরা পড়ে না। আর পড়ে না বলেই হঠাৎ গল্পকার যশোধরার গল্প পড়তে প্রলুব্ধ হয় পাঠকমন। যখন দেখে যে, কোন একটি দৈনিক কাগজের রবিবারের পাতায় আরো অনেক গল্পকারের সঙ্গে তাঁর মুখের ছবি ছাপা হয়েছে এবং তাঁর গল্পের আলোচনা হয়েছে। পাঠক হিসেবে অনেকেরই জানা নেই যে, তাঁর কোন গল্পগ্রন্থ আছে কি না, অথবা তিনি কতো অধিক সংখ্যক গল্প ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছেন। তখন হঠাৎ কেমন খারাপ লাগে। 'পণ্যসংহিতা'-র কবি যিনি পণ্যবিজ্ঞাপন, মিডিয়া এবং তথাকথিত দিশাহার বাজার অর্থনীতি নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর জীবনভাবনার কবিতা লিখেছেন, তিনি কি তবে নিজেও সেই ইঁদুরকলেই ধরা পড়লেন ?

তাঁর একটি দুটি গল্প পড়ার অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে লক্ষ্য করা যায় কবিতার ভাষাভঙ্গি একেবারে অবিকল উঠে এসেছে। গল্পের ভাষায় কবিতার ভাষাপ্রভাব খুব ভালো। তবে তারও বোধহয় একটা মাত্রা আছে। আর, সে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সে রচনা হয়ে ওঠে নিছক বাচালতা বা বাগাড়ম্বর। বস্তুতঃ, মাত্রাবোধই মূল কথা।

এই মাত্রাবোধই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে কবিতার জগতে,— যে জগৎ খুব সহজগম্য নয়। কাগজে কাগজে নাম ছড়ানো অনেকেই বিচরণ করেন সেই জগতের বাইরে। অথচ, কত অনায়াসেই যশোধরা সেখানে পৌঁছুতে পেরেছেন বলে মনে হয়। কোথাও তাঁর কোন চেষ্টাকৃত প্রয়াস নেই। কোন ইঁদুর দৌড়ে সামিল হওয়া নেই। নেই কোন শিবিরের তাঁবু। খোলা আকাশই তাঁর চিন্তার প্রতীক। সবাই তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহী। ফলে, কবি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আরো বেড়ে যেতে থাকে। এই বেড়ে যাওয়ার ভার বহন করা খুবই দুরূহ। এর জন্য জীবনচর্যা অনেকবেশি দুঃসহ হয়ে ওঠে। যে ভাষা তিনি হাতে পেয়েছেন, তাতে একজন খুব জনপ্রিয় কবির একেবারে ভয়ংকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খুবই স্বাভাবিক, প্রথম শ্রেণীর যে-কোন বড়ো কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অনুজ কবিদের প্রভাবিত করা। এও যেমন সত্য, তেমনি সত্য প্রভাবিত হওয়া। রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর শক্তি

চট্টোপাধ্যায় ? তিনি জীবনানন্দকে একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একটি ঘরোয়া আড্ডায় 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো'র মতো ভঙ্গিতে বলেছিলেন 'জীবনানন্দকে ছাড়তে পারি, কিন্তু কেন ছাড়বো ?' তেমনি যশোধরার কবিতার শিরোনাম 'সবচেয়ে উঁচু কবিকে আমি বলি'. ঠিক সেই বিশেষ কবির কবিতার একটি শিরোনাম মনে পড়িয়ে দেয়। কবিতার পঙ্‌ক্তি :

১) 'জানালায় জানালায় পুতুলদের ঘোরাঘুরি, ব্যস্ততা, তাকানো।
জানালায় জানালায় পুতুলদের দাঁড়ানো. শরীর প্রদর্শন।
আর জানালার দুদিকের কোনো পুতুলেরই ক্রয়ক্ষমতা নেই।'

২) 'লজ্জা ভয়, দোলের বিকেল, ভাঙা টবগাছের পাশে ভাঙা চুমু
আচমকা জড়িয়ে ধরা, বৃষ্টির বিকেলে ধুম জ্বর
কাপড়ে কলঙ্ক লাগা, চুপি চুপি ধুয়ে ফেলাটুকু
চূড়ান্ত পুকুরপাড় চূড়ান্ত রোহিণী সমাচার
এবং চূড়ান্তভাবে দেখে ফেলা বৌদিকে দাদার…'

এই প্রভাব থেকে মুক্ত কবিতার আশায় আমরা পাঠকেরা অপেক্ষা করে আছি। কেননা, তাঁর ক্ষমতা আছে, জীবনানন্দের ভাষায় বলা চলে 'কল্পনা-প্রতিভা' আছে। কিন্তু কবিতা তাঁর কাছে যে মগ্নতা বা তন্ময়তা প্রত্যাশা করে, তা হয়তো দিতে পারছেন না তিনি। স্বতঃস্ফূর্ততা বলে যে ব্যাপারটি তাঁর মধ্যে আছে, তাকে তো সচেতনতা দিয়ে. নির্মাণের কঠোর বিন্যাস দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তার মধ্যে তাঁর বহুতর জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলানো থাকবে পাঠ-অভিজ্ঞতা। কবিতার ভাষা,তার বিন্যাসকলা,এরকম অনেক কিছুই তাঁর করায়ত্ত। একথা সত্য যে নিরস পাণ্ডিত্য কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু পাণ্ডিত্য যিনি আত্মীকরণ করে নিতে পারেন, অর্থাৎ মনীষাচর্চা যাঁর লেখায় শুধু প্রাণহীন শব্দের কর্কশ-ধ্বনি উৎপাদন করে না, এমন কবিও তো আছেন।

রিলকে একজন কবিযশঃপ্রার্থীকে বলেছিলেন, 'গভীর নির্জন রাতে নিজেকে প্রশ্ন করো। তোমার কী বলার কিছু আছে ? সেই বলাটা তোমার একার হওয়া চাই।' যদি সে-কথা ইতিমধ্যে কেউ বলে দিয়ে থাকেন ? সে জন্যই তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে। কবিতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে। আমরা যশোধরার কবিতার পালাবদলের আশায় রইলাম। □

ভাস্বতী আচার্য

কবিতা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর □ পার্থ বসু
প্রোরেনাটা □ শিবপুর □ পনের টাকা

'কবিতা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' কবি পার্থ বসুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। বাচনভঙ্গীতে পার্থ স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল। পার্থর ভাষায় 'কবিতার তামাম প্রোটিন এড়িয়ে যাওয়া কঠিন' (একক : ৫৫ বর্ষ : ২য় সংখ্যা / 'কাল সারারাত')। স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তবে, প্রোটিনাধিক্য ক্ষতিকর। তাই, বাহুল্য বর্জন করেই পার্থ বর্তমান কাব্যগ্রন্থে প্রোটিনের মাত্রা সঠিক রেখেছেন ; প্রয়োগের নিপুণতায় স্বাস্থ্যকে রেখেছেন সজীব। অবশ্য অজান্তে ক্ষতি যে একটা করেন নি তা নয়, সেটা প্রোটিন সংক্রান্ত নয় বরং আপিম জাতীয়। পার্থ নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন, সে কবিতার নেশা : পার্থর কবিতা সম্বন্ধীয় নেশা।

ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, ছন্দপ্রকরণে পার্থর কবিতা এক নিজস্ব মাধুর্য্য ও সুষমায় দৃপ্ত। তাঁর কাব্য চেতনা, নির্মাণ, বাচনভঙ্গী, স্বভাবতঃই পাঠককে আকৃষ্ট করে। ভালও লাগে। চমকে পাঠক বিভ্রান্ত হন না বরং চিন্তার খোরাক পেয়ে সচেতন হন। সতেজ বক্তব্যে কবিতার পাঠককে সাবধান করতে গিয়ে নিজের অভিমানকে এক ফেস্টুনে লিপিবদ্ধ করেছেন 'বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ' এ —

"কবিরা কবিতা পড়ে, কবি শোনে,
কবিরাই শোনে—
তা হোক, তবুও কিনা
সাবধানের মার নেই।
চিহ্নিতকরণ হোক কবিদের গৃহ,
গৃহে অন্তরীণ হোক কবিকুল,
সদর দরজায় 'ভেতরে কুকুর আছে'
কথার আদলে

লেখা হোক—
'ভেতরে কবি আছে, সাবধান।'
এরপরেও. যদি কেউ নেশা করে,
কবিতার সর্বনাশা নেশা ;
কেউ যদি জাহান্নামে যেতে চায়—
—এসো।"

কবিতা লিখতে বসে পার্থ বাস্তবতার বাইরে এতটুকু পা ফেলেন নি। 'সাতসকালেই কেরাণী তাড়ানো' বৃষ্টি নামা দেখে যেমন লিখেছেন "জলছবি, কলকাতার", ঠিক তেমনই আবার "অষুধ" কবিতায় কোনরকম আড়াল আবডাল না করেই লিখেছেন : "জানি— / সকলেই কবিতা বোঝে না / কবিতা ও ঘোসা / কদলীর / করে দুটোকেই / পদলীন··· ।"

মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতা নিয়ে এই কবিতার বই, উপস্থাপনায় সজীবতার স্বাক্ষর বহন করে। কবি, একদিকে যেমন চলমান ঘটনাবলির মধ্যে থেকেছেন ; অপরদিকে তেমন আসন্ন শতাব্দীর জন্যে ছবি এঁকেছেন কাব্যমাধ্যমে :— "রাত ফুরোলে ফুল শুধু নয়, একটা শতক / ঝুরিয়ে যাবে, হারিয়ে, কালের গর্ভে গত / ফুলটা প্রতীক সম্ভবতঃ ॥" (ফুল শুধু ফুল নয়)

সুতীব্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন রেখেছেন—

"একুশ শতকে আর কোন সন্তান নয়।
প্রসববেদনা আর নয়, হোক ধ্বংস
প্রসূতিসদন—বিংশের অপরাহ্নে
এই প্রার্থনা—তার মানে নির্বংশ
হবে মানুষেরা ? হয়ে যাবে অবলুপ্ত ?

তেমনই, ঐ একই কবিতায় বিদ্রূপের কষাঘাতে লিখেছেন—

"ব্লাড ব্যাঙ্কের মত চালু হবে ডিমব্যাঙ্ক—
যে ছবি দেখতে পাচ্ছি মানসচক্ষে,
হিমায়িত করে রেখে ডিম সেই জিম্মায়
বুড়ো বয়সেও চাইলে বংশরক্ষে
করাটা তখন হবে অনায়াসে সম্ভব"

প্রকৃতই পার্থ'র কবিতা পড়ার দায় আছে বৈকী।

সমর্পণ মুখোপাধ্যায়

অবনের কয়েকটা দিন □ **সমীর কুমার রায়**
সিনেটহল □ **২৫ টাকা**

'অবনের কয়েকটা দিন' এরকম নামকরণে দিন-পঞ্জিকার সামান্য গন্ধ থাকলেও, আসলে এটি কল্পিত কাহিনীর সাজস্ত অতি ছোট একটি উপন্যাস। যার নায়ক শিক্ষিত তরতাজা আধুনিক মধ্যবিত্ত যুবক অবন রায়। পটভূমি হাল আমলের রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি উদ্বেলিত ভারতীয় সমাজ—যে সমাজকে নৈতিক অধঃক্ষেপণের ঘুন-পোকা কুরে কুরে খাচ্ছে। কৃষ্টি-সভ্যতা সংস্কৃতির ইমারতের ই'ট বালি খসে খসে পড়ছে। দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের জীবন-যাত্রায় নায়ক অবন সেই স্খলন-পতন প্রত্যক্ষ করছে আর তারই শিক্ষা-চিন্তার আলোকে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করছে। অবনের সব বিচার-বিশ্লেষণ যে সঠিক এবং নিখুঁত তা বলা যায় না। রোমান্টিক উৎসুক তেজী তরুণ হিসেবে অবন কিন্তু অধুনা গজিয়ে ওঠা সমস্যাগুলোকে ছুঁতে চেয়েছে। তার সমাধানের কথাও ভেবেছে। ধর্মের নামে ভণ্ডামি, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার বিষ, বেকার সমস্যা, ভাষার বড়াই, রিপু-উত্তেজক টিভি, বাঙালির সংস্কৃতি বিমুখতা সর্বোপরি যুব-সমাজের অবক্ষয় অবনের দিনগুলিকে মাস থেকে বছরে এবং বছর থেকে জীবনের জটিল যন্ত্রণায় অন্তর্লীন করে তুলেছে। যে যন্ত্রণা সাগরে ডুবো পাহাড়ের মতো অবস্থান করছে ঈশিতা—অবনের জীবনায়ন।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সমস্যাটা মূলতঃ রাজনৈতিক। মানে ভোট কেন্দ্রিক। ব্যক্তি পরিবার স্তরে এদের আন্তরিকতার অভাব নেই। কোনও কালেই ছিল না। লেখকও তা দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার আগুন ধান্দাবাজেরা জ্বালায়। তবুও কেন কেবল ক-পার্টির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ? কে বেশি মৌলবাদী, হিন্দু না মুসলিম, এ প্রশ্নের কি চট্-জলদি উত্তর আছে?

একটি বিষয় বুমেরাং-এর মতো হয়েছে। টিভির উষ্ণ অশালীন নাচ-গানের নারী-নগ্নতাকে হ্যাক-থুঃ করেও চুরাশি পাতার ছোট বইটিতে লেখক যত্রতত্র আমদানী করেছেন উভয়লিঙ্গের কাপড়-খোলা নগ্নতা, যৌনতা ও রিরংসা। কখনও অবচেতন মনকে আশ্রয় করে, কখনও বা স্বপ্নের মোড়কে। একই দোষে দুষ্ট হবার কারণে উদ্ধৃতি বর্জনীয়।

যৌনতা, অশ্লীলতা, হিংসা এবং কদর্যতার রসায়নে জারিত হয়ে যুবসমাজের স্নায়ুতন্ত্র শিথিল, রুচি ও সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ—এ সতর্ক বার্তা লেখক বুদ্ধিজীবীদের দিয়েছেন। কিন্তু সমাধানের পথ কোথায় তা বলেন নি। তাই পরিশেষে লেখক আমাদের প্রাচীন দার্শনিক দান্তের 'জঘন্য নরকের' দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ভবিষ্য-বক্তা ফকির দীন মহম্মদের মৃত্যু কল্পনার ফ্যানটাসিতে।

আজকের সমাজের অবক্ষয়ের সামগ্রিক চিত্রটা যে লেখকের কৌণিক দৃষ্টি এড়ায়নি, তা অবশ্য বইটি পড়লে বোঝা যায়। ❑

স্বর্ণকুমার পালধী

একুশ শতাব্দী

- তিনমাস অন্তর বেরোয়
  (জানুয়ারী—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—ডিসেম্বর)
- গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক তিরিশ টাকা। ডাকযোগে পঞ্চাশ টাকা।
- লেখকেরা অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন। সঙ্গে পুরো ঠিকানা দেবেন।

ছোট বড় সকলের ছড়ার বই

সাগর বিশ্বাসের

ছড়াছড়ি কলকাতা (২য় সংস্করণ)

প্রকাশিত হয়েছে

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

With best compliments from :

A WELL WISHER

Gautam Ganguli
New Alipore, Calcutta-700053

●

With best wishes from

R. Krishnan

●

ASHOK ENTERPRISE

Timber Merchants importers
& general order suppliers.
Rail gate No. 6, Bisharpara
North 24 Parganas.

EKUSH SHATABDI

A distinctive Bengali periodical ☐ DL No. 04/96

Vol. 1 ● No. 4 ● October—December 1996 ●Rs.10

With best Compliments of

LEMUIR AIR EXPRESS

26, Shakespeare Sarani, Calcutta 700017

India's Foremost International and Domestic Airfreight Forwarders & Consolidation.

Phone- 247-4326, 247-4327

40-0369 Grame Lemuir

Telex 021 2429 LAE IN. 021 7208 LM IN..

Fax. 9133400369

Regd. office : 12, K. Dubash Marg, Bombay 400023

Branches : Agra, Ahmedabad, Bangalore, Cochin, Delhi, Kanpur, Madras, Hyderabad, Trivendrum.

ডালিয়া রায় কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১২১ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।